৩৯ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
শিশু-মনে কুসংস্কার	অনিরুদ্ধ ঘোষ	৫
হুগলি নদীর নোনাজল	তপোব্রত সান্যাল	৮
জলাভূমি ভাবনা	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	১০
মাঠচুরি	গৌতম মিস্ত্রি	১৪
রাজা রামমোহন রায় (২য়)	জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার	১৮
কোথাকার জল কোথায়	রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য	২৩
গঙ্গাব্রতীর জীবন গেল	মেধা পাটেকার এবং	২৬
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	২৯
শোক সংবাদ		৩১
পুস্তক পরিচিতি		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৮৯০২৪১২২৯০/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

অদ্ভুত আঁধার

এক সময় পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি ছিল। সন্ধেবেলায় বই নেওয়ার জন্য লেগে থাকত ভিড়। এখন লাইব্রেরিয়ানরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। পাঠকের পা-পড়ে না! সরকার-পোষিত বলে গ্রন্থাগারিককে পাঠকদের চাঁদার ভরসায় থাকতে হয় না, এই যা। সাহিত্য পরিষৎ-এর মতো পুরনো বড় নামী লাইব্রেরি গুটিকয় গবেষকের দৌলতে টিমটিম করছে। পাড়ার লাইব্রেরির অনেকগুলো তো উঠেই গেছে! বইয়ের দিন গেলেও মাথা উঁচিয়ে ছিল লিট্‌ল ম্যাগাজিন! অনেক আবেগ, ভালবাসা, শ্রমে তৈরি। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট, ধর্মতলার ডেকার্স লেন, রাসবিহারীর মোড়, শেয়ালদা স্টেশন, শ্যামবাজারের মোড়— কোথাও এক চিলতে স্টল, কোথাও ভরসা ফুটপাথ। দোকানির সঙ্গে ক্রেতার নাম ধরে দাদা ডাকার সম্পর্ক। কোন পত্রিকা কবে বেরোচ্ছে, কে এল, কার আসতে দেরি হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিয়ে যায় অফিসফেরত বাবু, কলেজপড়ুয়া। অন্যদিকে, পত্রিকার লোকজন আসে খোঁজ নিতে— কটা বিক্রি হল, আরও চাই কিনা বা বিক্রি না হওয়াগুলো ফেরত বা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পয়সা নিতে। নতুন পত্রপত্রিকার বড় সহায় এই বিক্রেতাদাদারাই। শুধু পেটের তাগিদ নয়, এঁরাও যেন এই কর্মযজ্ঞের শরিক। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের যুগেও এই সেদিন ছবিটা একই রকম ছিল। হঠাৎ কোথা হইতে যেন কী হইয়া যাইতেছে! পত্রপত্রিকা ডাঁই হয়ে পড়ে থাকছে, খদ্দের নেই। তারকা-পত্রিকাও মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওঁরা এক-একজন দূর-দূরান্তর থেকে আসেন। টিফিনের খরচই উঠছে না, তো সংসার খরচ! কেউ কেউ তো ব্যবসা গুটিয়ে অন্য পথ দেখার কথা ভাবতেও শুরু করেছেন। অদ্ভুত আঁধার এক নেমে আসছে এ পৃথিবীতে।

সংবাদপত্রেরও অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে। তাই খবরটা একচিলতে হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল টেলিগ্রাফ কাগজে। হেল্‌থ ফার্স্ট শিরোনামে। তাতে বলা হচ্ছে, নেদারল্যান্ডে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন কিছু গাছের গায়ে ক্ষত, পাতা অকালে শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল বুঝি ভাইরাসের কাজ। পরে গবেষণায় ধরা পড়ে তা নয়, এটির কারণ ছটি উৎস থেকে কারিগরি বিকিরণ, যার কম্পাঙ্ক ২৪১২ থেকে ২৪৭২

মেগাহার্ৎস এবং মাত্র ২০ ইঞ্চি দূরে থাকা ১০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ। ডেনমার্কেও আরেকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলে। তাতে দেখা যায়, ওয়াইফাই বিকিরণের চৌহদ্দিতে পড়া কচি গাছপালা অকালেই মারা যাচ্ছে।

এ তো গেল গাছের কথা। প্রাণীদের ওপরেও এর প্রভাব আরও বিপজ্জনক। রেডিও-তরঙ্গ, তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাব পাখিদের বিকাশ ও প্রজননের ওপর। ১১৩টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এ তথ্য ধরা পড়েছে।

প্রযুক্তি-বিকিরণ শুধু গাছপালা আর পশুপাখির ক্ষতি করবে, মানুষকে ছাড় দেবে এমনটি তো নয়। আর ঠিক এই কারণে বেলজিয়াম সরকার ব্রাসেলসে তাদের ফাইভ জি-র পাইলট প্রজেক্টের কাজ থামিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা একবাক্যে রায় দিয়েছেন, এই প্রকল্প মানুষের জন্য নিরাপদ নয়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমরা যে ফাইভ জি ফাইভ জি বলে লাফাচ্ছি, তা তাবৎ জীবজগতের পক্ষেই ক্ষতিকর। সেলফোনের বিকিরণ নিয়ে আমেরিকার ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রকল্পে গবেষণা চালিয়ে এর প্রভাবে ক্যান্সার, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা থেকে ডিএনএ-র ক্ষতি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

ফাইভ জি-র সিগনাল আসা-যাওয়ার জন্য বাধাহীন পথ চাই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা তো গাছপালা। ফাইভ জি পাতার বাধা সামলে সহজে যেতে পারবে না। তাই তাকে বাধাহীনভাবে যেতে দিতে বলি দিতে হবে গাছকে। ভারতের সমস্ত টেলিকম কোম্পানিগুলো ফাইভ জি নিয়ে মহড়া দিতে শুরু করেছে জুন মাস থেকেই।

বাঁচার উপায় হিসাবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যত পারা যায় কম বেতার যোগাযোগ এড়াতে। যন্ত্রকে শরীর থেকে অন্তত তিন ফুট দূরে রাখতে হবে। ফোনে কথা বলতে গেলে হেড ফোনের ব্যবহার, বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে কেব্‌ল নেটওয়ার্কের ব্যবহার, ল্যাপটপ, পার্সোনাল কম্পিউটার এবং গাড়ির রেডিও থেকে ব্লুটুথ, ওয়াইফাই সংযোগ সরিয়ে ফেলতে হবে, ব্যবহার না করলে সমস্ত ওয়্যারলেস ডিভাইস বন্ধ রাখতে হবে, বিশেষত রাতে; ফোনে কথা বলার সময় কমাতে হবে, ফোন নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় তা বন্ধ থাকাই ভাল। তবে সবার আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে— উন্নত প্রযুক্তির নামে ক্ষতিকর প্রযুক্তির আমদানি করব কি না।

সুজল সুফল মলয়জশীতল শস্যশ্যামল দেশের বন্দনা করেছেন ঋষি বঙ্কিম। আমরা আনন্দে নিশ্চিন্তে ছিলাম। এতটাই নিশ্চিন্তে যে, মহানন্দে আশপাশে যেখানে যত পুকুর, জলাশয়, দীঘি ছিল বুজিয়ে ফেলেছি। কলকাতার ফুসফুস বলে পরিচিত পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে দু-একজনের বাগড়ায় এখনও পুরোপুরি বুজিয়ে ফেলতে না পারলেও, অনেকটা মেরে এনেছি। এখন হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকের দৌলতে এমন ভিডিও দেওয়া-নেওয়া হয়, যেখানে প্লাস্টিক দূষণ থাকে, প্রবল জলকষ্টের ছবি থাকে, জল-চেতন করার প্রয়াস থাকে। ওগুলো দেখলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ওঠে এমন নয়। বাথরুমে বালতি ভরতে দিয়ে অন্য কাজে ভুলে যাই, বাড়ির পাম্প ভরে জল পড়তে থাকে, রাস্তার কল তো বারোয়ারি, মা-বাপ নেই, বয়েই যায়।

এবারের চেন্নাইয়ের ভয়ঙ্কর জলখরা অনেকের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোথাও প্রবল বন্যা হয় মানেই যে সেখানে জলখরা হবে না, সে ধারণা ভুল। চেন্নাই তার বড় উদাহরণ। নদীলাগোয়া বড় শহরগুলোর বিপদ কম নয়, কারণ নদীর জলের অতি-ব্যবহার আর ভুল-ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা এক কোটির বেশি মানুষ বাস করেন এমন ৪০০টি শহর নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁরা এমন ২০টি শহরকে চিহ্নিত করেছেন যারা ভয়ঙ্কর জলসঙ্কটে পড়তে চলেছে, সেখানে প্রতি বছর বন্যা হওয়া সত্ত্বেও। আর এই তালিকায় কলকাতাও আছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া (নীতি আয়োগ) প্রকাশিত রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতে প্রতি বছর দু লাখ লোক মারা যায় পরিমাণ মতো জল না পেয়ে আর ৬০ কোটি ভারতীয় প্রবল জলকষ্টে ভোগেন।

কলকাতায় এখন বহুতলের রমরমা। ভূগর্ভের জল সাঁইসাঁই করে উপরে তোলা হচ্ছে। এখনও হুঁশ না ফিরলে মোটা গুনাগার দিতে হবে। বঙ্কিমের সুজলাং সুফলাং আক্ষরিক অর্থেই বঙ্কিম হয়ে উঠবে।

উমা

ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পাঠকেরা খেয়াল করুন

পাঠকরা একটু খেয়াল রাখবেন, আমাদের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ-এর নাম Utsomanush। তাই Utsamanush দিয়ে খুঁজবেন না। ওটি আমাদের পুরনো ঠিকানা, বর্তমানে বাতিল।

আমাদের ওয়েবসাইট: utsomanush.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

পর্ব ৮

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

চিত্রাঙ্গদার লিঙ্গ–পরীক্ষা!

আশীষ লাহিড়ী

এক

চিত্রাঙ্গদার গল্প আমরা সবাই জানি। মহাদেব বর দিয়েছিলেন, মণিপুর রাজবংশে শুধু পুত্রই জন্মাবে। কিন্তু দেখা গেল, প্রকৃতির খেয়ালের ওপর স্বয়ং মহাদেবেরও হাত নেই, সেই সত্যযুগেও ছিল না। তাঁর বর অগ্রাহ্য করে মণিপুর রাজবংশে জন্ম হল চিত্রাঙ্গদার। তার বাবা বললেন, কুছ পরোয়া নেই, আমি ওকে ছেলেদের মতো করেই মানুষ করব। চিত্রাঙ্গদা শিখল ঘোড়ায় চড়া, যুদ্ধবিদ্যা, তিরন্দাজি, তরোয়াল খেলা, বাঘশিকার। চেহারায় পুরুষালি ছাপ পড়ল। শরীরে বঙ্কিম কমনীয়তার বদলে কঠিন পেশিবহুলতা ফুটল। তির ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাত হয়ে উঠল কঠিন। এই করে সে বেশ ছিল। শিকার করত, ডাকাত ঠ্যাঙাত, সখীদের সঙ্গে গল্প করত। তার মনে কোনো খেদ ছিল না। প্রজারা তাকে অসম্ভব ভালোবাসত। প্রজাদের বিপদে আপদে সে সদা সহায়।

হেনকালে বাদ সাধল অর্জুন। সেই শালপ্রাংশু মহাভুজের পরিচয় না–জেনেই তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসল চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন হেসেই বাঁচে না। ঠাট্টা করে বলল, 'হা হা হা হা বালকের দল, মার কোলে যাও চলে নাই ভয়!' সে কী কথা! 'বালক'! বালিকা বললেও এক রকম হত! তার পর যখন চিত্রাঙ্গদা জানল অর্জুনের পরিচয় ('পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা') তখন লজ্জায় অপমানে সে এতটুকু হয়ে গেল। মনে মনে যাকে আদর্শ পুরুষ বলে ধ্যান করে এসেছে, আজ তারই মুখোমুখি সে! যতই পেশিবহুল চেহারা হোক, যতই রদ্দা মারার উপযোগী হাত হোক, তার নারীসত্তা জেগে উঠল। ঘ্যাঁচ করে সে প্রেম নিবেদন করে বসল। এবারও প্রত্যাখ্যান। অর্জুন নাকি 'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী!' নারীর প্রেম–ট্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া নাকি তার বারণ। চিত্রাঙ্গদা দ্বিতীয়বার অপমানিত হল। পুরুষালি বীর হিসেবেও নয়, কমনীয় নারী হিসেবেও নয়— কোনোভাবেই সে অর্জুনকে ভোলাতে পারল না। তখন সে বিখ্যাত হরমোন–বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মদনের কাছে গিয়ে বলল, একটা কোনো স্কল্পমেয়াদি থেরাপি দিতে পারেন, যাতে 'শুধু এক বরষের জন্যে' তার দেহ 'পুষ্পলাবণ্যে' ভরে ওঠে? একবার দেখি, কত তার ব্রহ্মচার্যের তেজ! ডাক্তারবাবু বললেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে এ আর এমন কী! চিত্রাঙ্গদা হরমোন থেরাপি নিল। দেখতে না দেখতে দীপিকা পাড়ুকোনকে হাফ টাইমে ছ গোল দিল। তখন অর্জুনের ব্রহ্মচর্য–ট্রহ্মচর্য ভেসে গেল। সে কাজকর্ম ছেড়ে চিত্রাঙ্গদার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল।

কাজ নেই, কর্ম নেই, অষ্টপ্রহর শুধু প্রেম একমাত্র হিন্দি সিনেমাতেই পোষায় (ঠিক জানি না, ইদানীং হয়তো বাংলা সিরিয়ালেও)। 'নারীর ললিত লোভনলীলায়' অর্জুন তাই দু দিনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। চিত্রাঙ্গদাও মিথ্যে রূপ দিয়ে অর্জুনকে ভোলাবার জন্য বিবেক দংশনে ক্লিষ্ট। পরের ঘটনা সদ্য–অতিক্রান্ত পঁচিশে বৈশাখের কল্যাণে আমাদের সকলেরই জানা। এসব নিয়ে আর বাক্যব্যয় করছি না।

আসলে এতক্ষণ যেটা বলা হল, সেটা অন্য একটা বিষয়ের উপক্রমণিকা। এবার চলে আসি মূল বিষয়ে।

দুই

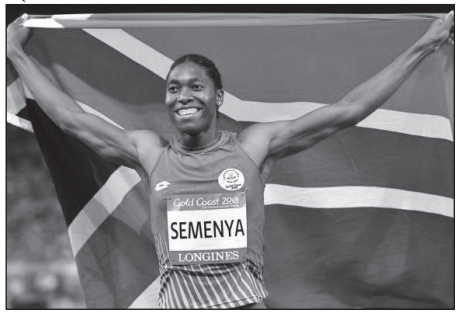

মোক্‌গড়ি কাস্তের সেমেনিয়া

মোক্‌গড়ি কাস্তের সেমেনিয়া (জন্ম ৭ জানুয়ারি ১৯৯১) দক্ষিণ আফ্রিকার একজন দৌড়বীরাঙ্গনা। ২০০৯ সালে ৮০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০১৬ সালের অলিম্পিকে সোনার মেডেল। ২০১৭ সালে নিজেরই রেকর্ড ভেঙে আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। মুশকিল করেছে তাঁর শরীর। তাঁর শরীরে পুরুষসুলভ লক্ষণ এত প্রকট যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে লিঙ্গ–পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা

ফ্র্যাঙ্ক মন্টগোমারি

হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁর শরীরে টেস্টোস্টেরোন নামক পুং-হরমোনের মাত্রা গড়পড়তা নারীর শরীরের তুলনায় বেশি। ফলে ২০০৯ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই তাঁর সব প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়া বারণ হয়ে যায়। তারপর ২০১০ সালে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ২০১৮ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার নিয়ম-নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটা নতুন নিয়ম চালু করে। তাতে বলা হয়, ৪০০ মিটারের বেশি দূরত্বর দৌড়-প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে গেলে মহিলা প্রতিযোগীদের শরীরে টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যদি কোনো মহিলার শরীরে ওই পুং হরমোনের মাত্রা ওই নির্দিষ্ট স্তরের ওপরে থাকে, তাহলে ওষুধ খেয়ে সে মাত্রা নামাতে হবে। তাঁদের যুক্তি, পুং হরমোনের মাত্রা বেশি থাকলে একজন মহিলা অন্য মহিলা প্রতিযোগীর ওপর 'অন্যায় বাড়তি সুবিধা' পেয়ে যাবেন, যেটা ক্রীড়াজগতের নৈতিকতার বিরোধী। কেননা খেলাধুলার একটা প্রাথমিক শর্তই হল সমান সুযোগের পরিস্থিতিতে কে কতটা নৈপুণ্য দেখাতে পারে। এক্ষেত্রে একজন যদি কোনো অসমান বাড়তি সুবিধা পেয়ে যায়, তাহলে সেটা খেলাধুলার সেই মৌলিক নীতির পরিপন্থী। এই নিয়মের বিরুদ্ধে মামলা করেন সেমেনিয়া। তাঁর যুক্তি, তিনি তো কোনো 'ডোপিং' করছেন না, কোনো কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় শক্তিবর্ধক হরমোন গ্রহণ করছেন না। তাহলে তাঁর স্বাভাবিক শারীরিক শক্তির বিরুদ্ধে এই অন্যায় জেহাদ কেন? গত ১৯ এপ্রিল ২০১৯ মামলার রায় বেরিয়েছে। সে মামলায় তাঁর হার হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে তাঁকে ওষুধ খেয়ে শরীরের পুং হরমোনের মাত্রা কমাতে হবে। নইলে মাঠের দরজা বন্ধ। আবারও মনে করিয়ে দিই, এটা কিন্তু 'ডোপিং'-এর ব্যাপার নয়; এটা তাঁর বা অন্য অনেক মহিলার শরীরের অকৃত্রিম হরমোন-মাত্রার ব্যাপার। সব পুরুষের শরীরেই কিছু পরিমাণে স্ত্রী-হরমোন থাকে; সব নারীর শরীরেই কিছু পরিমাণ পুং-হরমোন থাকে; এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কার শরীরে কোন হরমোনটা আপেক্ষিক মাত্রায় প্রধান, তারই ওপর নির্ভর করে তার লিঙ্গ-পরিচয়। কারো শরীরে যদি বিপরীত লিঙ্গের হরমোন বেশি থাকে, সেটা কি তার দোষ? তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে কেন?

ক্রীড়াকর্তাদের এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিশ্ব চিকিৎসক সঙ্ঘ। সঙ্ঘর সহ-সভাপতি ফ্র্যাঙ্ক উলরিচ মন্টগোমারি বিশ্বের চিকিৎসকদের কাছে আবেদন করেছেন, ডাক্তারবাবুরা যেন এই হরমোন-মাপামাপির খেলা থেকে দূরে থাকেন। তাঁর যুক্তি, কোনো ক্রীড়াবিদের শরীরের স্বাভাবিক হরমোন-মাত্রা ওষুধ দিয়ে কমানো ডাক্তারি নৈতিকতায় একেবারেই অসমর্থনীয়। কোনো কোনো মহিলার শরীরে স্বাভাবিকভাবেই পুং হরমোনের মাত্রা গড়পড়তার চেয়ে বেশি থাকে, সেই দশাকে বলা হয় ডিএসডি' (ডিফারেন্সেস অভ সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট)। সেটা কোনো অসুখ নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কারো নাক থ্যাবড়া, কারো নাক চোখা হওয়ার মতন ব্যাপার। কাজেই কোনো চিকিৎসককে যদি জোর করে 'ডিএসডি' দশাগ্রস্ত মহিলাদের পুং হরমোন-মাত্রা কমানোর জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়, সেটা অন্যায়।

ডাক্তার মন্টগোমারি পাল্টা একটা তোপ দেগেছেন, যেটা কাণ্ডজ্ঞানের বিচারে বেশ লাগসই। তিনি বলছেন, কোনো কোনো বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের উচ্চতা সাত ফুট; তাঁরা কম লম্বা খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশি সুবিধা পান। সেটাই স্বাভাবিক। কেউ কি বলবে, এত বেশি যাদের উচ্চতা, তাদের অপারেশন করে 'হাইট ছোটো' করে আসতে হবে?

সেমেনিয়া বা অনুরূপ হরমোন-মাত্রাযুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে যা বলা হচ্ছে, সেটা কিন্তু ওই হুকুমেরই সামিল। ডাক্তার মন্টগোমারির প্রশ্ন: এর শেষ কোথায়? (সূত্র: দ্য স্টেট্‌সম্যান, ৬ মে ২০১৯)

ডাক্তার লিওনিড আইডেলমান

বিশ্ব চিকিৎসক সঙ্ঘর সভাপতি ডাক্তার লিওনিড আইডেলমান পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন: 'এইসব নিয়মকানুনের নৈতিক মান্যতা নিয়ে আমাদের ঘোর সংশয় রয়েছে। মাত্র একটি কেস স্টাডির দুর্বল সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এসব নিয়ম চালু করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীসমাজে ওই কেস স্টাডি নিয়ে জোর বিতর্ক চলেছে। তাছাড়া এসব নিয়মকানুন বিশ্ব চিকিৎসক সঙ্ঘের বেশ কয়েকটি মৌলিক নীতিসূত্র-ঘটিত ঘোষণারও পরিপন্থী। তাই আমাদের দাবি, অবিলম্বে এগুলি প্রত্যাহার করা হোক'। (সূত্র, বিশ্ব চিকিৎসক সঙ্ঘের ওয়েবসাইট, ২ মে ২০১৯)

কাণ্ডজ্ঞান কী বলে?

শিশু-মনে কুসংস্কারের প্রভাব

অনিরুদ্ধ ঘোষ

ঘটনা ১

আইআইটি–র অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক বিভাস, খুব মন দিয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনার বছরদশেক হয়ে গেল। কঠিন বিষয় সহজভাবে পড়ানোর খ্যাতি আছে। তবু যখনই ছাত্রমহলে প্রচলিত নিজের ছদ্মনামটা মনে পড়ে, মনটা দমে যায়। ছাত্ররা আড়ালে তাঁকে 'রামধনু' বলে ডাকে। মায়ের চাপে তাঁর গুরুর পরামর্শে ধারণ করা দু হাত মিলিয়ে সাতখানা বিভিন্ন রঙের পাথরের আংটি। বেকারত্ব ঘোচাবার দুশ্চিন্তায় ধারণ করলেও কি যেন ভেবে আর খোলা হয়ে ওঠেনি!

ঘটনা ২

শ্যারন, হাসপাতালের বিছানায় বসে এখনও ভাবছিল কীভাবে ঘটনাটা ঘটল! পেশায় ক্রাইম রিপোর্টার। বাড়ির সামনের বাঁকটা ঘোরার পথে জীবটাকে রাস্তা পেরিয়ে যেতে দেখে কিছু না ভেবেই হ্যাঁচকা ব্রেক মেরে ফেলে। ফলস্বরূপ পিছনের গাড়িটা শ্যারনের গাড়ির পিছনে জোরে ধাক্কা মারে। শ্যারন প্রাণে বেঁচেছে কিন্তু গ্র্যানির মুখে কালো বেড়ালের ভয়াবহ সব গল্প যে এখনো তার মনে গেঁথে রয়েছে। এ ঘটনা না ঘটলে সে তা বুঝতেও পারত না।

'কুসংস্কার' নামক বিষফলটি আমরা খেয়েছি সৃষ্টির শুরু থেকেই। যখন থেকে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় পরিণত হয়েছে, আমরা দেখেছি প্রকৃতির বিপুল শক্তির সম্ভার। আর ভয় পেয়েছি। কিন্তু সেই ভয়কে ব্যাখ্যা করার শক্তি এসেছে আরও পরে। ফলস্বরূপ জন্ম হয়েছে অলীক অথবা অন্ধ কিছু কুসংস্কারের। কার্য–কারণ সম্বন্ধ যখন থেকে আমরা ব্যাখ্যা করতে শিখেছি, তখন থেকেই কুসংস্কারের মেঘ কাটতে শুরু করেছে। কিন্তু থেকে গেছে ঘুমন্ত দুরারোগ্য ব্যাধির মতো আমাদের অন্দরমহলে, স্মৃতির কোটরে। ব্যাখ্যার অতীত ঐ ভয় হয়ত প্রতিবর্ত প্রক্রিয়ার মতোই থেকে গেছে আমাদের জিনের গহীনে। চার্লস ডারউইন তাঁর 'মাইন্ড' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৮৭৭) লিখছেন: 'May we not suspect that the vague but very real fears of children, which are quite independent of experience, are the inherited effects of real dangers and abject superstitions during ancient savage times?' মানে, আমাদের মনে কি এই ধারণা আসা উচিত নয় যে, আদিম যুগের সেই পারিপার্শ্বিক বিপদ এবং ব্যাখ্যাতীত কুসংস্কার মনের গভীরে থেকে যাওয়ার কারণেই বংশানুক্রমে তা শিশুদের মনে অলৌকিক ও অপ্রকৃত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। [১]

সৃষ্টির শুরুর দিকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরাও কিন্তু মননের দিক থেকে শিশুই ছিল। শিশুরা হল কুসংস্কারের সহজ শিকার। একটি শিশু জন্মাবার পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে সর্বাংশে নির্ভরশীল তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর। তার চিন্তা, চেতনা সবই আসে চারপাশের মানুষদের থেকে। সারাজীবন শিশুদের মনন ও তার বিকাশ নিয়ে গবেষণা করে যাওয়া ড. জে ডি উলের (Woolley) কথায় 'children are highly suggestible and highly imaginative, which can lead to belief in casual relationships that don't make a whole lot of sense [২]

পরবর্তীকালের শিক্ষাদীক্ষা–সংস্কৃতির চর্চা তার মধ্যে বিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু আমূল বদলে দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মার্ক টোয়েনের একটি উদ্ধৃতিও উল্লেখ করা যেতে পারে: 'when even the brightest mind in our world has been trained up from childhood in a superstition of any kind, it will never be possible for that mind, in its maturity, to examine sincerely, dispassionately and conscientiously any evidence or any circumstances which shall seem to cast a doubt upon the validity of that superstition. I doubt if I could do it myself।' অর্থাৎ, যখন অত্যন্ত মেধাবী কোনো মানুষও শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন কুসংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, তখন তার পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেও সেই শিশুকালীন কুসংস্কারকে অস্বীকার করে কোনো বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত পক্ষপাতহীন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা অসম্ভব হয়ে

দাঁড়ায়। এমনকি, আমার তো সন্দেহ হয় যে আমিও হয়ত তা পারি না। [৩]

এ প্রসঙ্গে আমরা, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিল্‌স বোরের একটা অসাধারণ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। একবার এক বন্ধু গিয়েছিলেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী নিল্‌স বোরের বাড়িতে। কথার ফাঁকেই সেই বন্ধুর চোখে পড়ে নিলসের ঘরের দরজার ওপর একটা ঘোড়ার নাল (horse shoe) ঝুলছে। বন্ধু কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলে, 'Niels, it can't possibly be that you, a brilliant scientist, believer that foolish horse shoe superstition?' নিল্‌স তোমার মতো এক বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী কি অশ্বখুর-কুসংস্কারে বিশ্বাস করে? নিল্‌সের উত্তর ছিল, 'Of course not but I understand it's lucky whether you believe it or not.' বিজ্ঞানী নিল্‌সের উত্তর ছিল, অবশ্যই বিশ্বাস করি না। তবে আমি এটা বুঝি তুমি মান বা মান এটা সৌভাগ্যজনক। [৪]

শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের মঞ্চে এরকম বহু দিকপালকেই আমরা দেখেছি, অদ্ভুত সব কুসংস্কার বয়ে বেড়াতে। পাবলো পিকাসো, চার্লস ডিকেন্স, ফ্রিদা কালহো, সালভাদোর দালি— তালিকা সুদীর্ঘ। আমাদের দেশে তো বিজ্ঞানী থেকে রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনেতা, খেলোয়াড়, গাইয়ে, অভিনেতা— তালিকা তৈরি করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ঐসব কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস এত শিক্ষিত মানুষদের প্রভাবিত করল কীভাবে? নাকি 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার আগেই তাঁদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ আর চারপাশের মানুষদের থেকেই তা প্রবেশ করেছে তাঁদের ভেতর? একজন শিশু বা কিশোর পরবর্তীকালে কীভাবে এই দুনিয়াকে দেখবে, তা কিন্তু নির্ভর করে তাদের গুরুজন ও শিক্ষকেরা তাদের কোন পথে চালিত করবেন, তার উপর। অথচ অবধারিতভাবে এঁরাও সকলেই কমবেশি কুসংস্কারে আছন্ন!

তাই দেখতে-শুনতে-বুঝতে শেখার আগেই নবজাতকের কপালে কাজলের টিপ, বালিশের তলায় লোহার কাজললতা বোধহয় সেই অশনি সঙ্কেত— যে এই শিশুর মনে কুসংস্কারের গোড়াপত্তনের আর দেরি নেই। শুধু দেখতে-শুনতে-বুঝতে শেখার অপেক্ষা মাত্র।

ধর্মীয় কুসংস্কারের সাড়ম্বর উদ্‌যাপন আমরা রোজই চারপাশে প্রত্যক্ষ করি। কোনো ধর্মকেই এর বাইরে ফেলা যায় না। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নারীশিক্ষার অভাব, পুরুষতান্ত্রিকতার চোখরাঙানি আর ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেক সময়েই শিশু ও তার পরিবারের চিরস্থায়ী ক্ষতি করে। অতি কম বয়সে বাবা-মা হওয়া বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত মানসিক চাপের মধ্যে শিশুকে লালন-পালন ও তার ভবিষ্যৎচিন্তার অতিরিক্ত চাপ সামলাতে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেন ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারকে। মনস্তত্ত্ববিদ কেস ও তাঁর সহগবেষকগণ কুসংস্কার ও তার উদ্ভবের জনক হিসেবে দেখিয়েছেন: '...an individual's need to maintain a sense of control over their environment' এই তত্ত্বকে। [৫]

সময় ও দেশ বিশেষে এইসব ধর্মীয় বা সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে শিশুর প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। সে মহারাষ্ট্র বা কর্ণাটকের প্রত্যন্ত গ্রামে শিশুকে মন্দির বা মসজিদের উঁচু ছাদ থেকে টাঙিয়ে রাখা চাদরে ঝোলানোই হোক বা জাপানে সুমো কুস্তিগিরদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাঁদানো, অথবা মিশরে প্রচণ্ড শব্দদূষণ করে তাদের চমকানো— সবই নাকি শিশুর শুভকামনায়! এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই ইউরোপও। স্পেনে ক্যাথলিক মত অনুযায়ী পূর্বজন্মের পাপ কাটাতে একদল শায়িত নবজাতকের ওপর দিয়ে শয়তান বা 'সাজপোশাকধারী' একজনকে লাফাতে বলা হয়, তাতে অনেক দুর্ঘটনায় ঘটে। কখনও বা এই অন্ধবিশ্বাস আফ্রিকার এবোলা ভাইরাস আক্রান্ত শিশুকে হাসপাতালের পরিবর্তে নিয়ে গিয়ে ফেলে ওঝার উঠোনে যেখানে সে বিনা চিকিৎসায় ঝাড়ফুঁকের চক্করে পড়ে মারা যায়। কিছুদিন আগেও এ রাজ্যে সাপেকাটা মানুষ ওঝার ঝাড়ফুঁকে আখছার মারা যেত। ইদানীং সচেতনতা বেড়েছে। কয়েকটি সংগঠনের লাগাতার প্রচারের ফলে ওঝাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আন্টি-ভেনিন ইঞ্জেকশন বিতরণ করা হচ্ছে। তাতে করে ঝাড়ফুঁক ও আন্টি-ভেনিন একইসঙ্গে চলায় 'সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না' অবস্থাটাকে বদলাতে সাহায্য করেছে।

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কুসংস্কারকে কতখানি প্রত্যক্ষভাবে মদত দেয় তা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তার কারণ অতি উচ্চবিত্ত পরিবারেও ধর্মীয় গোঁড়ামির অনেক উগ্র চিত্রই দেখা যায়। তৃতীয় বিশ্ব গরিব, তাই কুসংস্কার বেশি, আর পাশ্চাত্ত্যের তাবড় ধনী দেশে কুসংস্কার কম— ব্যাপারটা ঠিক এতটা সরল বোধহয় নয়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোঁড়া খ্রিস্টান 'Jesus Group'-এর ঘোষণায় শিশুদের শেখানো হয় 'we believe that there's two kinds of people in this world: people who love Jesus and people who don't' [৬]

বহু শিশু এই ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়, সেই দেশের অতিসক্রিয় চাইল্ড সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও এই হাল! কানাডার কিউবেকে মৌলবাদী ইহুদি সংগঠন 'Lev Tahor'–এর ধর্মগুরুরা অভিযুক্ত হন শত শত শিশু–কিশোরকে মেলাটোনিন নামক ঘুমের ওষুধ খাইয়ে চরিত্রশোধনের চেষ্টার জন্য। আদপে যা শারীরিক নির্যাতনেরই নামান্তর মাত্র। জেনি ওয়ালিস এ প্রসঙ্গে তাঁর 'The Disturbing Psychological Impact of superstitions on children' নিবন্ধে লিখেছেন, 'These are the types of traumatic, scaring childhood experiences that can lead to drug and alcohol addictions in adulthood as well as serious mental illness, many of which goes undiagnosed and untreated.' মানে, শৈশবের এই ধরনের আতঙ্কপূর্ণ, ভীতিজনক অভিজ্ঞতা পরিণত বয়সে মাদক বা মদের নেশার দিকে নিয়ে যেতে পারে, কখনও বা গুরুতর মানসিক অসুস্থতার দিকে। যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না বা চিকিৎসাও হয় না। [৭]

তবে একথা অনস্বীকার্য, শিক্ষার অবকাশ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দারিদ্র্যের কারণেই অনেক কমে যায় শিশুদের ক্ষেত্রে। আবার শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ যে এখনও গুহাবাসী, তার আদিম পূর্বপুরুষেরই মতো মননে ও চিন্তনে, তা বলাই বাহুল্য।

এ তো গেল সমস্যার কথা। সমাধান তবে কী? আদৌ কি কোনো আদর্শ মডেল আছে? বোধহয় নেই। তবে নারীশিক্ষা তথা গণশিক্ষার প্রসার, গণমাধ্যমের সুচারু ব্যবহারে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার, বিজ্ঞানের পুঁথিগত পাঠের বাইরেও তার মূলমন্ত্রের আত্তীকরণ, সর্বোপরি ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা— 'আমরা–ওরা' এই ফাঁসের থেকে মুক্তি— এই কয়েকটি অন্যতম পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। তবে ভোটব্যাঙ্কের জন্য রাজনৈতিক প্রতিকূলতা অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত পদক্ষেপের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই দলমতনির্বিশেষে আধুনিক রাজনীতিবিদদেরও এগিয়ে আসতে হবে, তবেই এই জগদ্দল পাথরকে সরানো যাবে।

উজ্জ্বল এক নতুন ভোরে শিশুরা জেগে উঠবে এক নির্ভীক পৃথিবীতে, প্রকৃতির অমোঘ শক্তিকে দেখে ভয় না পেয়ে আকৃষ্ট হবে, 'কী' আর 'কেন'– প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করবে তার বিজ্ঞানমনস্ক গুরুজনদের এবং যথাযথ উত্তরের আলোকে খুলবে মনের বন্ধ জানালা। সেই উজ্জ্বল ভোরের আলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার আশা রাখতে পারি।

References:

(1) Charles Darwin - Mind 1877

(2) Wellman HM, Wooley JD. From simple desires to ordinary beliefs: The early development of everyday phychology. Cognition. 1990; 35; 245-75.

3) Mark Twain. Is Shakespeare Dead? From my Autobiography. 1909 pp 127-128.

4) Kenyon EE. The Wit Parade. The American Weekly. 1956, Sept.30; pp.13.

5) Case TI, Fitness J, Cairns DR, Stevenson RJ. Coping with uncertainty: Superstitions, Strategies and Secondary Control. Journal of Applied Social Phychology 2004; 34: 848-71

6) Dvorsky G. "The Art of Brainwashing Children" Sentient Developments. Science, Futurism, Life. 2014

7) Jemi Wallis. The Disturbing Psychological Impact of Superstitions on Children. Thought and Action.

উমা

বিধিসম্মত ঘোষণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী (১৯৫৬)–র ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান:	বিডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
২। প্রকাশকাল:	ত্রৈমাসিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রক:	বরুণ ভট্টাচার্য
৪। মুদ্রণস্থান:	জয়কালী প্রেস, ৮এ দীনবন্ধু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
৫। সম্পাদক:	সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১ শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা ৭০০ ০৩৬

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১ জুলাই ২০১৯ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক

হুগলি নদীর নোনা জল

তপোব্রত সান্যাল

একথা সকলেরই জানা যে, সমুদ্রের জল যেমন নুনে পোড়া, নদীর জল তেমন নয়। নদীর জলে সাধারণত নুন থাকেই না, উল্টে এই জলের স্বাদও ভাল। নদীতীরবর্তী বহু মানুষ নদীর জল দিয়ে রান্নাও করে। ব্যতিক্রম সমুদ্র-লাগোয়া নদীগুলি। প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটার সময় সমুদ্রমুখ থেকে সমুদ্রের নোনা জল নদীর বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত যাওয়া-আসা করে। তাই স্বাভাবিক কারণেই ওই জায়গার জল কম-বেশি লবণাক্ত হয়। হুগলি নদী আসলে ভাগীরথীর জোয়ার-প্রভাবিত অংশ হওয়ায় অঞ্চল ভেদে এর জলও কম-বেশি নোনা হয়।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, লবণাক্ততা বলতে ঠিক কী বোঝায়। লবণাক্ততা হল নদীর জলে দ্রবীভূত, মানে গুলে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের মাত্রার সূচক। মোদ্দা কথায় কতটা জলে কতটা নুন। প্রতি হাজার একক ওজনে কতটা একক ওজনের দ্রাব (Solute) জলে আছে, সেটা দিয়ে লবণাক্ততার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

সমুদ্রের জলের গড় লবণাক্ততা মোটামুটি ৩৪.৫ পিপিটি (Parts per Thousand)। এর অর্থ, প্রতি হাজার একক ওজনের সমুদ্রের জলে ৩৪.৫ একক ওজনের রাসায়নিক যৌগ দ্রবীভূত আছে। জলকে বিভিন্ন কাজে লাগানোর জন্য যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়, লবণাক্ততার মাত্রা তার একটা গোদা হিসাব।

শুধু জোয়ারের জলে দ্রবীভূত রাসায়নিক যৌগই নদীতে লবণাক্ততার একমাত্র উৎস নয়। মাটি ধুয়ে আসা বৃষ্টির জলেও (surface run-off) অনেক রাসায়নিক যৌগ থাকে। যেমন, চাষের কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকও বৃষ্টির জলে ধোওয়া মাটির সঙ্গে বাহিত হয়ে নদীতে এসে মেশে। তবে নদীর জলে লবণাক্ততার প্রধানতম উৎস সমুদ্র থেকে আসা জোয়ারের জলই।

হুগলি নদীতে লবণাক্ততার নিয়ামক কারণ তিনটি। (ক) উজান-থেকে-আসা লবণমুক্ত জলের পরিমাণ, (খ) জোয়ারের সঙ্গে ঢোকা লবণাক্ত জলের পরিমাণ এবং (গ) উজান-থেকে-আসা এবং জোয়ারের সঙ্গে ঢোকা জলের মিশ্রণের প্রকৃতি (diffusion characteristics)। পরীক্ষাগারে দেখা গিয়েছে যে, হুগলি নদীর জল মোটামুটি সুমিশ্রিত (well-mixed)। অবশ্য কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমও আছে। নদীতে এসে-পড়া সব রাসায়নিক যৌগ একই রকম দ্রবণীয় নাও হতে পারে। আবার হুগলি নদীর গর্ভ-সন্নিহিত জলস্তর ওপরের জলস্তরের চেয়ে তুলনায় বেশি লবণাক্ত।

হুগলি নদীতে লবণাক্ততা জলস্তর ভেদে এবং স্রোতপথ ভেদে ভিন্ন। এর মূল কারণ, উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ এবং সেইসঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা জোয়ারের জলের পরিমাণের নিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীলতা। শুখা মরশুমে উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ কমে গেলে নদীর জলের লবণাক্ততা বেড়ে যায়। আবার বৃষ্টির মাসগুলিতে উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ যখন বাড়ে, তখন নদীর জলে লবণাক্ততা কমে যায়। আর এটা সবার জানা, সমুদ্রমুখ থেকে দূরত্ব যত বেশি হয়, হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততাও আনুপাতিক হারে কমে যায়। ঠিক এর উল্টো ভাবে, মোহনা অঞ্চলে হুগলি নদীর জল তুলনায় বেশি লবণাক্ত। হলদিয়ার কাছে হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততার মাত্রা ১২ থেকে ১৮ পিপিটি-র মধ্যে থাকে।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ফরাক্কায় ব্যারাজ (সরন্ধ্র বাঁধ) নির্মাণের আগে গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে হুগলি নদীতে জল আসত অবাধে। শুখা মরশুমে হুগলি নদী মুখ্যত জোয়ারের জলেই সঞ্জীবিত থাকত। সে সময়ে বোধগম্য কারণে হুগলি নদীতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যেত। আবার বর্ষার সময়ে জল বেড়ে গিয়ে ভাগীরথীর জলে হুগলি নদীর যেন নতুন প্রাণসঞ্চার হত। তখন হুগলি নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ যেত অনেকটা কমে।

এখন পরিস্থিতির বদল হয়েছে। উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। ফরাক্কায় গঙ্গার জল আসার পরিমাণ এখন প্রত্যাশিত সীমার নিচে। ফলে উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ কম হলেও আগের মতো অনিয়ন্ত্রিত নয়। এজন্য ফরাক্কার নিচে ভাগীরথীর

হাল আগের চেয়ে ভাল হয়েছে বিশেষত শুখা মরশুমে। কলকাতার নিচে হুগলি পয়েন্ট (হুগলি নদী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল) পর্যন্ত অংশে পলি সঞ্চয় কমেছে, কমেছে বানের (bore) পৌনঃপৌনিকতাও। অবশ্য এসবের সঙ্গে হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততার তেমন সম্বন্ধ নেই, যা আছে তা হল, পলিসঞ্চয়ের ব্যাপারটা।

হুগলি নদীতে পলিসঞ্চয়ের একটা বড় কারণ, জলে লবণাক্ততার তারতম্যে ঘনত্বের (density) অসাম্য। এর ফলে অনুকূল ঔদক পরিস্থিতি সাপেক্ষে (hydraulic condition) নদীর গর্ভতল ঘেঁষে কোথাও কোথাও ঘনত্ব-জনিত স্রোত (density current) সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এর ফলে নদীগর্ভের পলি অপসারিত হয়। হুগলি নদীর পলি সংবহন প্রক্রিয়া (Sediment Transport Process) খুব জটিল। ঘনত্ব-জনিত স্রোত পলিসংবহন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

এসব ছাড়া লবণাক্ততার ব্যাপারে হুগলি নদীর প্রবাহপথের ভূমিতির (geometry) ভূমিকা আছে। হুগলি নদীর প্রবাহপথ সরল নয়, উত্তল-অবতল সঙ্কুল। যেখানে অবতল বক্রিমা (concave bend), সেখানকার গভীরতা আশেপাশের গভীরতার চেয়ে বেশি। এই গভীরতাই প্রমাণ ভাঁটার টানের প্রবল। ভাঁটার টান বেশি বলে লবণাক্ততাও তুলনায় সেখানে কম। যেখানে বক্রিমা উত্তল (convex), সেখানে জোয়ারের আধিপত্য, গভীরতাও সেখানে তুলনায় কম এবং লবণাক্ততাও অপেক্ষাকৃত বেশি।

হুগলি নদীর জলে কেবল রাসায়নিক যৌগেরই অস্তিত্ব নেই। হুগলি জলে সংবাহিত হয় বিপুল পরিমাণ নানা আকার ও বৈশিষ্ট্যের পলিকণা। লবণমুক্ত ও লবণযুক্ত জলের মিশ্রণকে এই বিপুল পলিভার কতটা প্রভাবিত করে, তা নিয়ে কোনো বিশদ গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের নির্যাস হল যে, হুগলি নদীর জলে অঞ্চল ভেদে ও কাল ভেদে লবণাক্ততার মাত্রার গড় নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, কারণ নিয়ামক কারণগুলি নিত্য পরিবর্তনশীল। এইসব কারণ মুখ্যত প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত। যাই হোক, হুগলি নদীর লবণাক্ততার বিষয়টি কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। প্রায় চার দশক আগে পুনের সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চ স্টেশনে (CWPRS) এ বিষয়ে সমীক্ষা হয়েছিল। তারপরে এ দেশে এ নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

উমা

ভুল, দুঃখিত

গত 'এপ্রিল-জুন' সংখ্যায় বিবেক সেনের 'স্বাভাবিক তাপমাত্রা' শীর্ষক লেখাটির শেষাংশ অনবধানে বাদ পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে দুটি ছবি। তার জন্য আমরা দুঃখিত। সেই বাদ-পড়া অংশ এবং ছবি দুটি নিচে দেওয়া হল—

'এবার আমরা গোড়া থেকে শুরু করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কীভাবে পৌঁছাতে পারি সেটা দেখা যাক।

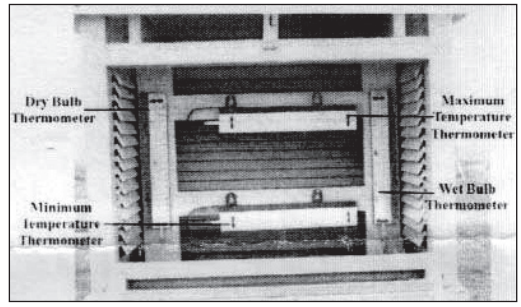

প্রথমে আমাদের একটি স্টিভেনসন স্ক্রিন তৈরি করাতে হবে যেখানে আবহাওয়াবিদের সমস্ত শর্ত পালন করা হয়েছে। এবার স্ক্রিনের পেছন দিকে একটি কাঠামো তৈরি করে সেখানে একটি সর্বোচ্চ ও একটি সর্বনিম্ন এই দুটি তাপমান যন্ত্র ভূমির প্রায় সমান্তরালভাবে লাগানো হল। এগুলি ছাড়াও একটি ড্রাই বাল্ব ও একটি ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার উল্লম্বভাবে দুপাশে ঝোলানো আছে। এই দুটো থেকে পাওয়া যাবে দিনের তাপমাত্রা ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্থাৎ হিউমিডিটি। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমানের মানচিত্র তৈরি করা। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাই পরবর্তী কাজ হল উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক বছরের ৭৩টি ভাগের গড় নির্ণয় করা এবং তারপর ৩০ বছরের উপরোক্ত গড়গুলির ৭৩টি ভাগের প্রত্যেকটির গড় নির্ণয় করে স্বাভাবিক (নর্মাল) তাপমানের মানচিত্রটি তৈরি করা।'

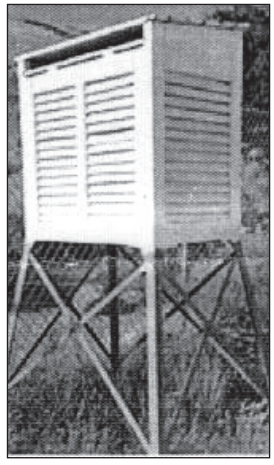

আশপাশের পরিবেশ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো আগ্রহই তৈরি হচ্ছে না!

ধ্রুবা দাশগুপ্ত

সারা বিশ্বে, এমনকি আমাদের দেশেও, জলাভূমি প্রেমিকেরা ২রা ফেব্রুয়ারি দিনটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্ব জলাভূমি দিবস হিসাবে পালন করে থাকেন। এ বছর জলাভূমিচর্চার কেন্দ্রস্থল বা মূল প্রতিষ্ঠান রামসার ব্যুরো নজর দিয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকে। তাদের এবারের বার্তা— আমরা জলাভূমিকে যেন উষ্ণায়ন রোধের স্বাভাবিক সমাধান হিসেবে দেখি, জলাভূমি ভরাট করা বন্ধ করি এবং জলাভূমি বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করি।

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আমরা একটি আশাব্যঞ্জক টুইট পেয়েছি রাজ্যের কাণ্ডারীর কাছ থেকে: Today is World Wetlands Day. Our government is committed to protecting the East Kolkata Wetlands, which is a Ramsar site, and all other wetlands in the state as they play a crucial role in maintaining environmental balance.

ত্যেকটাই মহামূল্যবান কথা। কিন্তু মানছে কে? বিংশ শতাব্দীতে ৬৪ থেকে ৭১ শতাংশ জলাভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং এই গতি মন্থর হওয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেন? কোথায় বাধছে? প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বেশি দূর না গিয়ে আমাদের শহরের পূর্ব কলকাতার জলাভূমি থেকেই শুরু করি। ভারতের তথা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের শহরেরই দায়িত্ব এইটা সুনিশ্চিত করা যেন, তাদের শহরবাসীর ব্যবহৃত ময়লা জল এবং বর্জ্য পদার্থ সুষ্ঠুভাবে পরিশোধন ও নিষ্কাশন হয় তথা যথাসম্ভব পুনর্ব্যবহৃত হয়। কলকাতা শহরের পাশে এই জলাভূমি বিশ্বে পুনর্ব্যবহারের নজির স্থাপন করেছে। তবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। আমাদের জানা শুরু করা উচিত এই জলাভূমির অস্তিত্বেরও আগে থেকে যখন কলকাতার ময়লা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পিত ভাবে তৈরি হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৎকালীন পুর প্রশাসকেরা ঠিক করেন, আমাদের নিষ্কাশন ব্যবস্থা মাটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং ময়লা জল তথা বৃষ্টির জল একই ব্যবস্থা দিয়ে নির্গত হবে। তাতে কলকাতার নগর পরিকল্পনা রূপায়িত হলে দেখা গেল যে, এই নিষ্কাশন ব্যবস্থা দিয়ে যে ময়লা জল বয়ে যাবে তা মাছচাষের পক্ষে যথোপযুক্ত। কলকাতার উপকণ্ঠে বিংশ শতাব্দীর শুরুর থেকে ময়লা জলে মাছচাষের যে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা এখানকার মৎস্যজীবীরা চালু করেছিলেন, তা শহরের ময়লা জলকে উৎকৃষ্টভাবে পরিশোধিত করে তথা বাঙালির প্রিয় খাদ্য মাছেরও পর্যাপ্ত

জোগান দেয়। মৎস্যজীবীদের দরকার ছিল ময়লা জলের ক্রমাগত জোগান, যা সম্ভব হল ১৯৪৪–৪৬ সালে তৈরি বানতলা লকগেট সম্পূর্ণ নির্মিত হওয়ার পরে। এর পরে ভেড়ি এলাকা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেল এবং ময়লা জলে সবজি এবং ধানচাষও চালু হল। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠেই তার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর এক গ্রহণযোগ্য উপায় স্থাপিত হল। এখানে তিনটি বিশেষ কথা লক্ষণীয়। প্রথমত, আমাদের সেই আমলের পুর প্রশাসকেরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা একটি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে একটি খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, সেটি সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাঁরা তৎকালীন সমস্যার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন, যা একই সঙ্গে নগর পরিকল্পনা হিসেবে এবং এলাকার মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর উপায় হিসেবে উৎকৃষ্ট ছিল।

তৃতীয়ত, যে সৃজনশীল চিন্তাধারা দিয়ে জলাভূমি অধিবাসীরা ময়লা জলকে পরিপোষক হিসেবে উপলব্ধি করে একটা বিস্তারিত কর্মক্ষেত্র তথা উৎপাদন ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন, তা তৎকালীন পুর প্রশাসকেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছিলেন। এইখানেই তাঁরা আমাদের কাছে নমস্য।

আমরা আজ এখান থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? আমাদের পূর্বসূরিরা তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সৃজনশীলতার তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং জলাভূমিকে আমাদের সমাজজীবন তথা অস্তিত্বের অংশ হিসেবে দেখতে পেরেছিলেন। একটা শহরকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যে তার ভবিষ্যতের পক্ষে কতটা উপকারী, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে মানুষগুলি ময়লা এবং ময়লা জল পুনর্ব্যবহার করার ব্যাকরণ তৈরি করেছিলেন, তাঁরা সমাজের কম পাওয়া স্তরের মানুষ। তাদের স্বল্প প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে জীবনধারণ করা যে অত্যাবশ্যক, সেই অবস্থান থেকেই যে কোনো জিনিসকে সৃজনশীলভাবে পুনর্ব্যবহার করার জীবনদর্শন জন্মানো স্বাভাবিক। তাই ময়লা জলকে দূষণকারী হিসেবে না দেখে ওঁরা এটিকে পরিপোষক হিসেবে গ্রহণ করে, বুদ্ধিদীপ্তভাবে ব্যবহার করেন এবং মাছ, সবজি ও ধানচাষ করেন। এই পরীক্ষামূলক চাষ করবার জন্য যে সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, তা তাঁরা সহজেই দেখতে পেরেছিলেন, তাঁদের হারাবার কিছু ছিল না। ফলস্বরূপ তাঁরা এমন কিছু চাষ করতে পারলেন, যা স্বাস্থ্যকর এবং সুষম আহার তথা সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্তই উপযোগী। আমাদের মত ক্রান্তীয় দেশের শহরে সূর্যরশ্মির আশীর্বাদে এক পরিপূর্ণ ফলনশীল সম্পর্ক তৈরি হল কলকাতা শহর আর তার উপকণ্ঠের সঙ্গে। আমাদের ময়লা জল পরিশুদ্ধ করে, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে, নিজেরা বেঁচে থেকে– আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখলেন জলাভূমির অধিবাসীরা।

এই অধিবাসীদের একটা অদ্ভুত সৌন্দর্যবোধ ছিল। তাঁদের উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা পরিচ্ছন্নতা বোধ কিন্তু সর্বদাই কাজ করত। এই জলাভূমি এলাকা অত্যন্ত মনোরম– এই এলাকার মানুষজন এই পরিচ্ছন্নতা কখনই ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। প্রতি বছর দেশ–বিদেশ থেকে পর্যটক এবং শিক্ষার্থীরা এই জায়গায় এসে চমৎকৃত হয়েছেন। এই এলাকার এখনকার চিত্র কিন্তু কিছুটা ভিন্ন। তাতে পরে আসছি।

সর্বোপরি যে দুটি কারণে এই জলাভূমি আজও টিকে আছে তা হল, এর নিকাশী ব্যবস্থা ও পরিশোধন ব্যবস্থার উৎকর্ষ। জলাভূমিতে আসা যে ময়লা জল পরিশোধন হওয়ার পরে কুলটি নদীতে গিয়ে পড়ে, তা জলাভূমির অগভীর পুকুরগুলিতে সূর্যের আলোয় বদলে যায়। এই ময়লা জল যে জীবাণু থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন তার নাম ই কোলাই। এই জলাভূমির অগভীর পুকুরে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জীবাণুমুক্তির পদ্ধতি এবং মাছচাষের প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলে। দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এই পুকুরভিত্তিক পরিশোধন ব্যবস্থায় ময়লা জল যেভাবে জীবাণুমুক্ত হয়, তা কোনো যান্ত্রিক উপায়ে পরিশোধনের থেকে অনেক বেশি কার্যকর। শহরবাসী তথা পুর প্রশাসনের এতে কোনো খরচ লাগে না। অথচ গঙ্গানদীর উপর অবস্থিত অনেক শহর যান্ত্রিক পরিশোধন ব্যবস্থায় প্রচুর ব্যয় করে ময়লা জল পরিশোধনে ব্যর্থ হয়ে গঙ্গাকে কলুষিত করে চলেছে।

এবার আসি কলকাতাবাসীর কথায়। আমরা জলাভূমিকে কীভাবে দেখি? যখন সেটা পরিষ্কার জলাভূমি হয়, যেমন রবীন্দ্রসরোবর, তখন আমরা জলাভূমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হই, জোর গলায় প্রতিবাদের চেষ্টা করি। এমনকি আইনের দ্বারস্থ হতেও পিছুপা হই না। এতে আমাদের নিজেদের নামও কিছুটা উজ্জ্বল হয়। নীতিবোধ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ দুকথা বলতে পারি।

কিন্তু যখন পূর্ব কলকাতার জলাভূমির মতো একটি ভিন্নধর্মী প্রকৃতিক সম্পদের কথা আলোচনায় আসে, তখন এক তীব্র

উদাসীনতা এবং সন্দিহান মনোভাব আমাদের যেন গ্রাস করে! সমাজের কিছু স্বল্পসাক্ষর, স্বল্প-আয় করা, স্বল্পচর্চিত মানুষ যে লোকচক্ষুর প্রায় অন্তরালে, নিঃশব্দে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একই সঙ্গে ময়লা জল পরিশোধন এবং খাদ্য উৎপাদন করতে পারে, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধা হয়। এই মনোভাব শুরু হয় অনেক অল্প বয়স থেকে। কিছুদিন আগে শহরের একটি নামী-দামি ইংরাজি স্কুলের কিছু বাচ্চাকে এবং তাদের শহরে তাদেরই অতিথি হয়ে আসা একটি জার্মান স্কুলের কিছু বাচ্চা ও তাদের শিক্ষিকাদের জলাভূমি ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, এই শহরের এই জীবন্ত ঐতিহ্য সম্পর্কে জার্মান বাচ্চাগুলির আগ্রহ অনেক বেশি এবং তাদের শিক্ষিকারাও নানাবিধ প্রশ্ন করে সেগুলির উত্তর জানবার চেষ্টা করছেন। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের দেখে মনেই হল না যে তারা কোনো শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসেছে, নতুন জায়গায় এসে চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখার কোনো আগ্রহই তাদের নেই। অথচ তারা স্বচ্ছন্দে দীর্ঘক্ষণ ধরে মোবাইল ব্যবহার করে বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াটস্-অ্যাপ বা ফেসবুকে গল্প করে চলেছে দিব্যি। চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে জানবার আগ্রহকে আমরা যে মেরে রেখে দিচ্ছি, এ সম্পর্কে কোনো চেতনাই আজ আমাদের মধ্যে কাজ করে না। এর দায়বদ্ধতা কে নেবে?

অবশ্য বড়দের কথা বললে নতুন ভাবনার বিষয় সামনে আসে। বড়রা অনেক সময়ই নিজেদের জ্ঞানের পরিধিকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ সম্মান দেন। কোনো পরিচিত সমস্যার ভিন্ন ভাবনায় ভাবিত এবং সফলভাবে প্রয়োগ করা সমাধানকে নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে সততই রাজি হন না, অথবা সন্দেহ প্রকাশ করেন। মাসকয়েক আগে দিল্লিতে নদী নিয়ে গবেষণা করেন অথবা সংরক্ষণ করেন অথবা উভয় কাজই করেন এমন মানুষদের একটি জাতীয় মহা-সমারোহে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রিত ছিলাম। বিষয় ছিল গঙ্গার পুনরুজ্জীবন কি সম্ভব? কিছু প্রথম সারির গবেষণাভিত্তিক কাজের সঙ্গে পরিচয় হল সেই সম্মেলনে। জানতে পারলাম, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য ময়লা জল পরিশোধন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়েই সব কিছুর ইতি। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি যে এই বিকেন্দ্রীয় ময়লা জল পরিশোধনের উদাহরণ হিসেবে অনুকরণীয়, এটা যে সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং সমাদৃত, এটা জানলেও এর থেকে কেউ কিন্তু শিখতে রাজি নয়। সকলেই সমস্যা নিয়ে কথা বলতে অত্যন্ত আগ্রহী কিন্তু সমাধান খোঁজার কোনো তৎপরতাই নেই। মনে হল, যেন গবেষণা প্রকল্প তৈরি করার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব, সেটা তুলনায় অনেক সোজা এবং অর্থকরী কিনা! সমাধান খুঁজতে তো অনেক বেশি ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় লাগে, আর তাতে অর্থের নিশ্চয়তাও বিশেষ নেই, তাই না?

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আরও বুঝেছি, আমরা, শিক্ষিত সমাজের দাবিদাররা কিন্তু শহরের জলকে দূষণকারী হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত, পরিপোষক হিসেবে নয়। আমরা ঘরের পাশের মানুষগুলোর থেকে শিখতেও রাজি নই, বিশেষ করে তারা যখন কেতাদুরস্ত নয়। অথচ বিদেশিদের শেখানো গালভরা নামকরণের কথা 'সার্কুলার ইকনমি' আমরা বাহবা দিয়ে শিখি। এই কথাটা অনায়াসেই ভুলে যাই যে সার্কুলার ইকনমি আসলে পুনর্ব্যবহারের আহ্বান, যা আমাদের ঘরের পাশের মানুষগুলো অনেক আগে থেকেই করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির স্বনামধন্য পরিবেশবিদ তথা বার্তাবহ প্রয়াত ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এই চিন্তাধারাকে বলতেন 'কগনিটিভ অ্যাপার্টেইট' (Cognitive Apartheid), আমাদের চিন্তাজগতের ভেদবুদ্ধি। আমরা বিশ্বাস করতে চাই না, আমাদের হীনম্মন্যতায় আঘাত লাগে এটা স্বীকার করতে যে অখ্যাতনামা মানুষের টিকে থাকার তাগিদে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতে পারে। এটা আমাদের লজ্জাজনক সীমাবদ্ধতা, যা আমরা অনেক সময়ই বুঝতেও চাই না, কারণ তা আমাদের নিজেদের কাছেই নিজেদের ছোট করে দেবে! এইখানেই আমাদের সমস্ত চেতনা যেন রুদ্ধ হয়ে যায়।

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্র ধাপা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে ইতি টানব। বেশ কিছুদিন ধরেই ধাপার দূষণ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখালিখিতে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিছু মানুষ ধাপার ময়লা ঢিবি থেকে নির্গত ধোঁয়াকে শহরের বায়ুদূষণের মূল কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এখানে প্লাস্টিক পোড়ানো হচ্ছে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারই সঙ্গে আরও কিছু মানুষ ধাপায় উৎপাদিত জৈবনির্ভর সবজিচাষ কতটা নিরাপদ তার সম্বন্ধে সর্বদাই প্রশ্ন তুলে চলেছেন।

শহরের বিভিন্ন কঠিন বর্জ্য পড়ে ধাপায় এবং কয়েক হাজার কুড়ুনি রোজ এই ময়লা ঢিবিতে কাজ করে পুনর্ব্যবহার হওয়ার যোগ্য সমস্ত বস্তু নিখরচায় আলাদা করে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেন, যা আবার আমাদের কাছে শহরে ফিরে আসে। ধাপা আমাদেরই ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া বর্জ্য

দিয়ে তৈরি এবং তার মধ্যে ৬০ শতাংশ জৈব, যা পুনর্ব্যবহার যোগ্য। কিছু বছর আগেও এই জৈব বর্জ্য ধাপার সবজি ক্ষেতে পড়ত, যা কোনো অজ্ঞাত কারণে আজ আর ফেলা হয় না। ধাপার সবজি খাওয়া কতটা নিরাপদ তার যে কোনো বিচারই তুলনামূলক হওয়া উচিত। প্রভূত পরিমাণে সার-বিষ দিয়ে উৎপাদিত হয়ে আমাদের শহরে অন্যান্য জায়গা থেকে আসা সবজির নিরাপত্তা সম্পর্কেও একই প্রশ্ন করা প্রয়োজন, যা ধাপার সবজির সম্পর্কে করা হয়ে থাকে।

আর প্লাস্টিক পোড়ানো নিয়ে কিছু কথা অনুধাবনযোগ্য। কিছুদিন আগে জানা গিয়েছে, জাতীয় পরিবেশ গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাদের গবেষণার প্রাথমিক ফল হিসেবে দেখিয়েছে, কলকাতার দূষণের অন্যতম কারণ শহরের গাড়ি থেকে বেরোন ধোঁয়া এবং রাস্তা তৈরি ও শহরে নির্মীয়মাণ বিভিন্ন প্রকল্পের থেকে নির্গত ধুলো। ধাপা এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এখানে প্লাস্টিক পোড়ানো ধোঁয়ার যে কথা বলা হচ্ছে, তা বিগত কয়েক বছর ধরে অভিযুক্ত, চামড়ার ছাঁট কারখানা ও অবৈধ প্লাস্টিকের কারখানা থেকে আসছে। জলাভূমি এলাকার মধ্যে এরা ঠাঁই করে নিয়েছে। সবজি ক্ষেত দখল করে বেড়ে-ওঠা এইসব কারখানা অনেক আগেই প্রশাসনিক নজরে আসা প্রয়োজন ছিল। তাহলে এই সমস্যা আজ দেখা দিত না। রামসার স্বীকৃত এই জলাভূমিতে তাদের ঠাঁই হওয়ার কথাই নয়।

ধাপা পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধাপা থেকে আমাদের বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের শিক্ষা শুরু হয়। ধাপায় যেমন কঠিন বর্জ্য পুনর্ব্যবহৃত হয়, জলাভূমির বাকি অংশে ময়লা জল পুনর্ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই এই এলাকাকে সংযুক্তভাবে বলে ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েস্ট রিসাইক্লিং রিজিয়ন। এই জন্যই এই এলাকা রামসর স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই লেখার গোড়ায় করা প্রশ্নগুলোতে ফিরে আসি। ঘরের পাশের জলাভূমিকে শহরেরই সুস্থ অস্তিত্বের জন্য মর্যাদা দেওয়ার মানসিকতা যদি আমাদের না থাকে, তবে কোনো জলাভূমিই সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। উল্টে রামসারের বার্তার বিপরীতে গিয়ে জলাভূমি অবিরত ভরাটই হতে থাকবে। এই অবস্থাই আজ পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অধিবাসীদের অস্তিত্ব সঙ্কটে এনে দিয়েছে। তাই এই জলাভূমি দিবস যদি এই অঙ্গীকার দিয়ে শুরু করি যে, জলাভূমির অস্তিত্ব জনকল্যাণের জন্যই— এই কারণেই আমরা জলাভূমিকে গুরুত্ব দেব, তাহলেই একমাত্র ভবিষ্যতে উন্নতিসাধন হতে পারে। আমরা কি উন্নয়নকে এই দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে রাজি আছি?

উমা

মাঠচুরি

গৌতম মিস্ত্রি

বাংলা ভাষায় 'পুকুরচুরি' বলে একটা শব্দ আছে। আমাদের আলোচ্য মাঠচুরি। রূপক–অর্থে নয়, একেবারে খাঁটি মাঠচুরির কথাই বলতে চাই। ভাবী প্রজন্মের স্বার্থে, প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থে, আপনার–আমার সবার জন্য সেই চুরি–করা মাঠ ফেরত পেতে চাই। ফোয়ারা দিয়ে সাজানো আর স্পর্শকাতর ঘাসে–ঢাকা পার্কের সৌন্দর্যের চেয়ে ধুলো–কাদার মাঠের আবেদন আর প্রয়োজন একটুও কম নয়। তথাকথিত সৌন্দর্যায়নের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু দ্বিতীয়টার প্রয়োজন আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের জন্য অনেক বেশি জরুরি।

আমরা, যারা জীবনের অর্ধ শতাব্দী পার করে এসেছি, ছেলেবেলায় স্কুল থেকে এসে বইয়ের ব্যাগটা ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে একদৌড়ে হাজির হতাম বাঁশবাগানের পাশে, অনাবাদী এক চিলতে এবড়ো–খেবড়ো মাঠে। পাশেই ছিল একটা বেলগাছ আর কয়েকটা জামগাছ। মাটিতে পড়ে–থাকা বেল ফাটিয়ে আর জামগাছে চড়ে বিকেলের টিফিন হয়েই যেত। গোঁফ–গজানো দাদারা চাঁদা তুলে সরস্বতীপুজো করত। তাদের কাছ থেকে একটা ফুটবল আদায় করা গিয়েছিল। আর কী দরকার! তাতেই সারা বছরের বৈকালিক বিনোদনের বন্দোবস্ত হয়ে যেত। কুঁচোকাঁচারা একপায়ে লাফিয়ে বেড়াত কিতকিত খেলার কোর্টে। হে বালক–বালিকা ও কিশোর–কিশোরীর দল, তোমাদের কাছে কিতকিত খেলা যদি অচেনা লাগে, তার দায় বর্তায় আগের প্রজন্মের ওপর। কিতকিত

খেলা আমার জানা সবচেয়ে কম খরচের স্বাস্থ্যকর বিনোদন, যেটার আভাস এই লিঙ্কে কিছুটা পেতে পারেন (https://www.youtube.com/watch?v=GN8IPxAskD8)।

সারা বিকেলের এই ক্রীড়া বিনোদনের সম্বল একটা ভাঙা টালির টুকরো। দিনের আলো নিবে এল, সূর্যি ডোবে ডোবে হয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। পাশেই ছিল পদ্মদীঘি। সন্ধ্যায় মা রুদ্রমূর্তি ধরে লাঠি নিয়ে না হাজির হলে পুকুর থেকে ওঠার কথা মনে পড়ত না। সেই মাঠে এখন দু-একটা বাড়ি গজিয়েছে। বাকি অংশ রেলিং-ঘেরা পার্ক। সেখানে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করা যায় না, বেণী দুলিয়ে কিতকিত খেলাও সেখানে বারণ। সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পার্কের তালা খোলেন এক পুরকর্মী। বৃহস্পতিবার তাঁর ছুটি। পার্কে ঐ দু ঘণ্টা কতিপয় প্রবীণ নাগরিক যান ছাউনি দেওয়া বেঞ্চিতে আড্ডা মারতে। তিনফুট চওড়া বাঁধানো একটা নাতিদীর্ঘ পায়ে চলার পথে গল্প করতে করতে গজগমনে দু-এক চক্কর কেটে নেন কিছু স্থূলবপু মানুষ। তাঁদের জানা হয় নি বা জানা হলেও বিশ্বাস হয়নি, কিংবা বিশ্বাস হলেও সেই জ্ঞানকে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রয়োগের প্রেরণা পাননি যে, র‍্যাম্পে বেড়ালের মতো (ক্যাটওয়াক) হেলেদুলে হাঁটলে চিকনতনুর অধিকারী হওয়া যায় না! কেন যায় না সেটা অন্য আলোচনা।

বাপ-ঠাকুরদার আমলের মাঠগুলো এখন রেলিঙের বেড়ায় আবদ্ধ হয়ে, ফটকে এক মস্ত বন্ধ তালার গয়না পরে বেবাক লুণ্ঠিত হয়ে গেছে ও ক্রমাগত হয়েই চলেছে। যেখানে বছর বিশেক আগেও যখন খুশি, যেমনভাবে উচ্ছে পছন্দ মতো ঘুরে বেড়িয়ে একমনে নিজের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন, আর সদ্য-ফোটা ফুলের মতো আমাদের উত্তরসূরিরা নিজের ইচ্ছে মতো নেচে কুঁদে বেড়াত নিজের সাবলীল খেয়ালে। বিজ্ঞ ও সংবেদনশীল আপনি, দূর থেকে সেই অপরূপ দৃশ্যের দর্শক হয়ে নিশ্চিতে শেষের দিনের প্রহর গুনতে দ্বিধা করতেন না। ইদানীং সেই চেতনায় একটা মস্ত আঘাত আমার-আপনার অচেতনেই ঘটে চলেছে। সেটা আপনিও বোধহয় খেয়াল করেছেন। খেয়াল না করে থাকলে আমার আর্তি— অন্তত একবার পড়ুন।

টালির ছাওনি দেওয়া কুঁড়েঘর থেকে জীবনের পথচলা শুরু করে যে কিশোর-কিশোরী তাদের কথা অন্যরকম। তাদের এই আলোচনা থেকে বাদ দিচ্ছি। তাঁদের হাজারও সমস্যা। আপনার বা বিশেষ করে আপনার পরবর্তী প্রজন্মের খাওয়া-পরা আর পড়াশোনা করার প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে গেলে তারপর তাদের বিনোদন আর স্বাস্থ্য সুরক্ষার চাহিদায় মনোনিবেশ করতে ইচ্ছে জাগে। এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন একফালি মাঠের। স্কুলপাঠ্যের দৌলতে 'স্থিতি জাড্য' ও 'গতি জাড্য' নামে একটা ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত। ইংরেজিতে যা 'ইনারসিয়া অভ রেস্ট' এবং 'ইনারশিয়া অভ মোশন'। নিউটনের আবিষ্কৃত একটি মৌলিক জাগতিক সূত্রের প্রথম সূত্র। বস্তু স্থির অবস্থায় থাকতে থাকতে যে শক্তি সঞ্চয় করে তা স্থিতি জাড্য, আর চলতে চলতে যে শক্তি অর্জন করে তা গতি জাড্য। এই সূত্রের ব্যাখ্যা, আবেদন আর প্রয়োগ বহুমুখী। আমার এইক্ষণে একটা জাগতিক রূপকের কথা মনে পড়ছে।

কেবল আমাদের নয়, সুদূর অতীত থেকেই কুঁড়ে ছাত্রছাত্রীরা হস্টেলের ঘরের হাউসকিপিং-এর খবরদারির তোয়াক্কা করে না। চালাক-চতুর ছাত্রছাত্রী জানে, পড়ার বইগুলো বন্ধ করতে নেই, বইপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খুলে রাখতে হয়। তাতে অলস মুহূর্তের স্থিতি জাড্যে (এটা রূপক, মুহূর্তের ভর নেই, জাড্য হয় না) অপেক্ষাকৃত কম ঠেলা দিয়েই আবার বইয়ের পাতার শেষ অক্ষর খানির পরের থেকে অল্প আয়াসে পড়া শুরু করা যায়। পরিপাটি করে সাজানো কাচের পাল্লা দিয়ে তালাবন্ধ থাকার জন্য বই ছাপা হয় না। পরীক্ষা পাসের আগে ঘরের মাঝে, টেবিলের উপরে, বিছানায়, মাটিতে ছড়ানো-ছিটানো। কোনোটা খোলা, কোনোটা ওল্টানো, বিভিন্ন রঙে দাগানো, পাতায় ছাপা অক্ষরগুলো চারপাশে লেখা টীকাটিপ্পনী দিয়ে সজ্জিত। এই বইগুলো সুদৃশ্য না হলেও আমাদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ করে। অমন করে বই নিংড়ে তার নির্যাস আমরা আর কখনও আত্মস্থ করার সুযোগ পাই না। বইপড়ার জন্য আলমারির তালা খুলে, নির্দিষ্ট বইটি বের করে, তার সূচিপত্র থেকে প্রয়োজনীয় পাতাটি খুঁজে নিয়ে পড়া শুরু করতেই আমার মতো কুঁড়ে মানুষদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়। পড়া শুরু করার এই অবাঞ্ছিত স্থিতি জাড্যকে (!) কবর দিয়ে তবেই আমার মতো কম প্রেরণার মানুষগুলো পরীক্ষার বৈতরণী পার করে থাকে।

আবার কম্পিউটারের লেখালিখির কথা যদি ভাবেন, উইন্ডোজ নামক জনপ্রিয় মাধ্যমের পাশে কম জনপ্রিয় মাকিন্টসে লেখালিখি করার যে প্রযুক্তি আছে সেখানে এক বছর পরেও লেখার বা পড়ার জন্য সেই ফাইলটা খুললে ঠিক যে জায়গায় আপনি এক বছর আগে লেখা বা পড়া শেষ করেছিলেন, ঠিক সেই পাতাতেই আপনাকে নিমেষে পৌঁছে দেবে। এসবই মানুষের প্রেরণার দুর্বলতায় সাহায্যের হাত বাড়ানোর প্রচেষ্টা। আমার মতো অনেকের কাছেই হাঁটাহাঁটি

করাটা একটা কর্তব্য, বিনোদন নয়। কুঁড়ে মানুষের কর্তব্যে সাহায্য করার জন্য তার পায়ের নাগালে একফালি মাঠ চাই। অনেকরই প্রেরণা ততটা প্রখর নয়, যে গাড়ি চালিয়ে বা বাসে চেপে গড়ের মাঠে হাঁটতে যাবেন। জিমন্যাসিয়ামে যাবার সময় বা আর্থিক স্বচ্ছলতা মুষ্টিমেয় মানুষেরই জন্য বরাদ্দ থাকে। পাড়ার সস্তার জিমন্যাসিয়ামে যাবার সুযোগ হলেও সেথায় ট্রেড-মিল নামের হাঁটার যন্ত্রটা যথেষ্ট সময়ের জন্য পাওয়া যায় না অনেক সময়েই। পাঁচতারা ক্লাবের জিমন্যাসিয়ামে যাবার সুযোগ যাদের আছে তাদের এই লেখা না পড়লেও চলে।

মাঠের পার্কে অবনমন এরকমই এক পশ্চাদপসরণের রাজনৈতিক অভিসন্ধি। এটা ঘটে চলেছে আমাদের অজান্তে ও বিনা প্রতিরোধেই। প্রতিরোধের ভাবনা তখনই ভাবা যায়, যখন ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা বুঝতে পারা যায়। আমি ক্ষতিটা সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি মাত্র। বাকিটা রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের বিষয়— সেটা কেবল অক্ষরের বিস্তার নয়।

আমি যে অঞ্চলে থাকি সেথায় চুরি হয়ে যাওয়া মাঠগুলো এখন লোহার রেলিঙের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে বেশ লাগে। সেখানে ধুলো নেই, বরং সাজানো ফুলের বাগান আছে। আছে বিদ্যুৎ পরিচালিত ঝর্না। মাঠ পার্কে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে চপল চঞ্চল শিশুদের চপলতা বরদাস্ত হয় না। সবুজ 'ইম্পোরটেড' ঘাস বড় স্পর্শকাতর।

সুন্দরী-প্রতিযোগিতার কদর্যতা লঘু করার জন্য আলাদা করে বিজ্ঞাপন দিতে হয় 'সুন্দরী হলেও বুদ্ধিমতী (beauty with brain)'। এ যেন এক ধরনের সাফাই— 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি!' জবরদখল করা সরকারি পার্কের সামনে এমন নোটিশ টাঙানোর দায়ও নেই। ধুলো-কাদার মাঠে মাটির স্পর্শ পাওয়া যায়, খেয়াল খুশি মতো ডিগবাজি খাওয়া চলে। চপলতা বিদ্বেষী গুরুগম্ভীর মানুষের জন্যও সেথায় মেঠো হাওয়া কমতি পড়ে না। সেই মাঠগুলোই এখন রেলিঙে ঘেরা সুদৃশ্য পার্ক। যদিও আপনার ষাটোর্ধ্ব বয়স হয়ে গেলে যে মাঠে আপনার কৈশোরে ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াতে পারতেন, সেখানে আপনাকে সরকারি নিয়ম মতে সরকারি কর্মচারীর দাক্ষিণ্যে সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারে ঢুকতে পারবেন। কোথাও কোথাও পকেটের কড়িও গুনতে হবে। ভেবে দেখুন, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বা অফিসকাছারির যুবক-যুবতীরা তাঁদের কাজের ফাঁকে তাঁদের সময়মতো সেখানে ঢুকতে পান না। নয়নাভিরাম পার্কের প্রয়োজন মাঠের চেয়ে আলাদা, মাঠ চুরি করে পার্ক বানিয়ে ফেললে সেখানে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকা উচিত, যেমনটা উন্নত দেশে থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পার্কগুলো কারিগররা সেটাকে সাজানো সুন্দরীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বানায়, যেটা দেখতে ভাল, কিন্তু কাজের নয়। কয়েক দশক আগে প্রতিটি পাড়ায় বেশ কিছু ফাঁকা জমি পড়ে থাকত। সেগুলো হয়ত কারও ব্যক্তিগত ফাঁকা জমি অথবা সরকারি খাসজমি। খোঁজ নিলে জানা যায়, শহর, শহরতলি বা গ্রামেও এখন এই ফাঁকা মাঠগুলোয় ঘরবাড়ি গজিয়ে গেছে অথবা রেলিঙে ঘেরা পার্ক হয়ে গেছে। পার্কে হাঁটার জন্য তিন ফুট চওড়া একটা বাঁধানো পথ বানানো থাকে, যেখানে হাঁটার জন্যই মানুষের 'ট্রাফিক জ্যাম' লেগে যায়। মানুষগুলো তবে হাঁটবে কোথায়? পার্কের ৮০ শতাংশ ভরা থাকে বসার বেঞ্চি, ফোয়ারা, ফুলের বা পাতাবাহারের গাছ, বেরসিক শিল্পকর্মের নমুনা স্বরূপ কিছু মনীষীর কাঁচা হাতে তৈরি দৃষ্টিকটু মূর্তি আর কিছু পলকা দোলনা। ছুটে বেড়ানোর মাঠটা এভাবে লোহার খাঁচাবন্দি হয়ে খাঁচার পাখি হয়ে নগরের শোভা বাড়াচ্ছে, কাজে লাগছে না।

কাজে লাগছে না কথাটা বোধহয় পুরোটা সত্যি নয়। কারও কাজে নিশ্চয়ই লাগছে! পার্কের নির্মাণে কারিগর-শিল্পীদের ও সেটার নির্মাণের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের যে স্বার্থ পূরণ হচ্ছে না, এমনটা কে বলতে পারে! তাছাড়া পার্কের কোণে যে ফাস্ট ফুডের দোকানটা গজিয়ে উঠেছে, তার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। পার্কে যাওয়ার তাগিদটা এখন আর শরীরচর্চা নয়, পার্কের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা আর ফাস্ট ফুডের দোকানে মাটন রোল খাওয়া লোকগুলো মাঠে ছুটে বেড়ানো শিশু আর কিশোর-কিশোরীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জায়গা জবরদখল করে বসেছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। উপায় না দেখে শিশু আর কিশোর-কিশোরীরা তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় খেলা করে বা এখনও যে জমির মালিক বাড়ি বানাননি তার অপরিসর ফাঁকা জমিতে ফুটবল পেটায়। পার্ক তালাবন্ধ থাকে।

পার্কনির্মাণ একটা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, পার্ক তৈরি হয়ে গেলে সেটাও একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটা মাঠচুরি করে নয়। চুরি হয়ে যাওয়া মাঠ যখন পার্কে রূপান্তরিত হয়, সেথায় কচিকাঁচাদের বালখিল্য আচরণকে যে কোনো মূল্যে আটকানোর চেষ্টা হয়। দুঃখজনক হলেও নির্ভেজাল নিষ্পাপ বারোয়ারি চাহিদাকে ব্যবসায়িক চাহিদা পরাস্ত করে ফেলেছে। আমাদের আগে বারোয়ারি চাহিদাকে বুঝতে হবে, তর্ক করতে হবে, সহমত হতে হবে, সঙ্গবদ্ধ হতে হবে। তারপর তার প্রতিরোধের কথা ভাবা যেতে পারে। হাঁটাহাঁটি করার ক্ষমতা মানুষের মানুষে বিবর্তনের এক অমূল্য

প্রাপ্তি। অনেক ফ্যান্টাসির মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর ক্ষমতা, অভ্যেস ও প্রচেষ্টা মানুষের প্রিয় হওয়া উচিত। সেই পাওনাকে আমরা ভুলে যেতে বসেছি, কারণ, এর অভাবের অবস্থা বা এই প্রাপ্তি না থাকলে আমাদের কী সমস্যা হয় সেটার সম্যক ধারণা আমাদের সহজাত নয়। সমঝদার ডাক্তার আপনার ভালোর জন্য আপনাকে দৈনিক হাঁটতে বলেছেন। তা কোথায় হাঁটবেন? অনেক কষ্টেসৃষ্টে, হিসেবনিকেশ করে হাঁটবার সময় আর প্রেরণা আপনি সংগ্রহ করেছেন। এবার নাগালের মধ্যে হাঁটার জায়গা চাই। হাঁটবার জন্য নিরাপদ ও সস্তা জমি কোথায় পাবেন?

মানুষ তবে হাঁটার জন্য কোথায় যাবে? মাঠ নেই, পার্কের ফটকে মস্ত এক তালা— হাঁটার জন্য রাস্তার ধারে নিরাপদ ফুটপাথ নেই। বহুতল টাওয়ারের ফ্ল্যাটে থাকা মানুষগুলোর নিজের ছাদও নেই। বা ছাদ থাকলেও সবসময় সেখানে যাওয়ার উপায় নেই। হাঁটুতে বাতের রোগের ছোঁয়া লেগে গেলে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে চড়ার উপায় নেই। নিজের বাড়ির ছাদ থাকলে আর হাঁটুতে বাত না থাকলে ছাদে হয়ত গেলেন, কিন্তু ছাদে হনহনিয়ে হাঁটার পরিসর কই? হনহনিয়ে না হাঁটলে ওজন কমে না, হার্টের সুরক্ষা হয় না।

যাদের মনটা আর তত কচি নেই, তাঁরা অবসর কাটানোর জন্য পথের ধারে গামছা পেতে এক প্যাকেট তাস নিয়ে সারা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিতে পারেন। যাঁদের সচ্ছলতা একটু বেশি তাঁদের জন্য অভিজাত ক্লাব আছে, সেখানে মনোরঞ্জনের জন্য রঙিন পানীয়ের গ্লাস হাতে একা বা গুষ্টিসুখ উপভোগ করা যেতেই পারে। সমস্যা কচিকাঁচাদের। তারা যায় কোথায়! তাদের জন্য পড়ে থাকে কংক্রিটের ঠাসবুনোনের মাঝে অপরিসর সবুজের স্পর্শবঞ্চিত, আর একটা প্রাসাদের ভার বহনের অপেক্ষায় একফালি জমি অথবা এক টুকরো রাস্তা। সেখানে কিশোর–কিশোরীদের স্বপ্নজগৎ পড়ে থাকে। তবে সেই স্বপ্নজগতের স্থায়িত্বকাল বড়ই কম।

বিশেষ করে কারও কুক্ষিগত নয়, স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর মত জনসাধারণ ও অন্যান্য জীবের কাছে এক টুকরো পৃথিবী মানবসভ্যতার প্রথমদিকে সহজলভ্য ছিল। সেই স্বাধীনতায় আঘাত আমাদের এই গরিব দেশের আগে সভ্য পাশ্চাত্ত্যেই শুরু হয়ে ছিল। এটাকে পাশ্চাত্ত্যের সভ্য মানুষ 'এনক্লোজার' বলেন। ব্যক্তিগত বাসস্থানের বাইরে চাষাবাদের ও শিকারের জন্য উন্মুক্ত বেড়াহীন পৃথিবী ছিল। আমাদের উত্তরসূরি অপেক্ষাকৃত কম সভ্য মানুষ প্রথমে যৌথভাবে ও ক্রমে এককভাবে চাষাবাদ করত। চাষের সময়ের বাইরে সেই অঞ্চলগুলো একক মালিকানাভুক্ত ছিল না। কে কোন জমিতে চাষাবাদ করবেন সেটার উপায় মোটেই কম ছিল না। বিস্তৃত পৃথিবীর মাটির উপরে যার যেখানে পছন্দ সেখানটা চাষের উপযুক্ত করে নিত। সেই জমির একছত্র মালিক না হয়েও তার চাষের ফসল গোলায় তুলতে কোনো অসুবিধা হত না। চাষের মরসুমের বাইরে সেখানে গৃহপালিত পশু চড়ে বেড়াত ও অন্য কাজে যে যার প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারত। তারপর মালিকানাভিত্তিক সীমিত পৃথিবী ভাগ বাটোয়ারা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। সমাজ নিয়ন্ত্রণের কর্তাব্যাক্তিরা পরে তাতে সিলমোহর লাগিয়ে কর্জ আদায় করে সমাজবদ্ধ মানুষের ভূসম্পদকে সুরক্ষিত রাখার আশ্বাস দিল। তখনও বেশ কিছু পৃথিবীর মাটি ও জল বারোয়ারি ছিল। প্রথমে এই বারোয়ারি ভূসম্পদকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিল ইউরোপের শাসকেরা। দ্বাদশ শতাব্দীতে জমির চারধারে বেড়া দেওয়ার প্রথা ইউরোপের শাসকদের সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের সমস্ত জমি বেড়ার গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে গেল। গৃহপালিত পশু চারণের জন্য আলাদা করে জমির প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

পৃথিবীর উন্মুক্ত জমিকে বেড়া দেওয়ার ইউরোপের এই আধুনিক সংস্কৃতি জার্মানিতে পৌঁছতে চারশো বছর লেগে গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে একই নিয়ম শুরু হওয়ার প্রস্তুতির আভাস পাওয়া গেলেও সেটার সরকারি স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় সমর্থন পাওয়ায় গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ক্রমশ এই বেড়া দিয়ে ব্যাক্তিগত মালিকানার পৃথিবীর টুকরোর বন্ধন স্বীকৃত হয়ে গেল ডেনমার্ক, ফ্রান্স, রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া আর পোল্যান্ডে। সভ্য দেশের সংস্কৃতি আর নিয়মকে অনুসরণকারী ভারতবর্ষের পিছিয়ে (!) থাকার ঝুঁকি নেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না আর তাঁদের অভিভাককদের মধু খাওয়ার লোভ থাকাই দস্তুর। (https://www.britannica.com/topic/enclosure)।

কিন্তু ইদানীং চাষের জমিতে আল বা বেড়া দেবার বিপক্ষে কিছু প্রতিবাদী আওয়াজ শোনা যায়, তার বিশ্লেষণ আর আলোচনা সমগোত্রীয় হলেও কিঞ্চিৎ আলাদা। আমরা আপাতত মাঠের ডাকাতির বিরুদ্ধে নিতান্ত করুন আবেদন জানাচ্ছি। সেই আওয়াজ জোরালো হলে পৃথিবীর অকিঞ্চিৎ মানুষের সাধ্য কি তাকে নস্যাৎ করে। যেটুকু জানা যাচ্ছে, পশ্চিমী দুনিয়ার আওতায় পৃথিবীকে এখনও পুরোপুরি ব্যাক্তিগত মালিকানায় ঘিরে ফেলা সম্ভব হয়নি। এখনও কিছু সার্বজনীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব সেখানে আছে, যেখানে সে দেশের স্বাধীন নাগরিক তার ইচ্ছেমতো নেচেকুঁদে বেড়াতে পারে।

উমা

রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার

আগের সংখ্যার পর

৫

রামমোহন রায়, তখনকার চিরাচরিত এবং দীর্ঘ প্রচলিত প্রথা 'সতী'–র বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রচার করেছিলেন। 'সতী' শব্দটির মাধ্যমে সাধারণভাবে এক শুদ্ধচরিত্রের এবং পবিত্র নারীকে বোঝানো হয়। কিন্তু দেখা যায়, এর মাধ্যমে মহিলাদের এক কর্মানুষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে স্বামীর প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি তাঁর মৃত স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় নিজেকে পুড়িয়ে দেবেন। অনেক মহিলাই এই আত্মোৎসর্গে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রথা সূক্ষ্মভাবে বিধবাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা উপায়। কাজেই যা স্বেচ্ছাকৃত ছিল তা সামাজিক আদেশমূলক অবস্থায় পরিণত হল। যদি কোনো বিধবা এই নিষ্ঠুর প্রথায় সমর্পণ না করতেন তাহলে তাঁর আর কিছু প্রত্যাশা করার ছিল না। তিনি একটা অপমানকর জীবন লাভ করতেন এবং এমনকি অনেক সময় শারীরিক নিগ্রহও জুটত।

সাধারণভাবে, রামমোহন রায় মেয়েদের উন্নতির বিষয়ে প্রচার করেছেন এবং সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, ঐতিহ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য লড়াইয়ের চাইতে সর্বোচ্চ সীমায় উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে গ্যালিলিওর অ্যারিস্টটলের (যাঁর প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ইউরোপে সে সময় প্রাধান্য পেয়েছিল) অনুগামীদের বিরুদ্ধে প্রচারের কথা মনে পড়ছে। তাঁর যুক্তি ঠিকমতো সাজানোর অভিপ্রায়ে, গ্যালিলিও 'ডায়ালগ বিটুইন টু ওয়ার্ল্ড সিস্টেম' নামে একটা বই লিখলেন। এই বইয়ে তিনটি চরিত্র ছিল। একজন ঐতিহ্যবাহী, যিনি অ্যারিস্টটল এবং তাঁর ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বের অন্ধ অনুরাগী। তিনি প্রাচীন তত্ত্বকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয়জন নিকোলাস কোপার্নিকাস প্রবর্তিত সূর্যকেন্দ্রিক (হেলিওসেন্ট্রিক) তত্ত্বের অনুরাগী। তৃতীয় চরিত্র নিরপেক্ষ এবং এই কথাবার্তায় পর্যবেক্ষক। এইখানে যুক্তির মাধ্যমে গ্যালিলিও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ দিলেন, অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব ভুল এবং অযৌক্তিক ক্ষেত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৮১৮ সালে রামমোহন রায় একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার 'এডভোকেট' এবং 'বিরোধী'দের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর যুক্তি বলেছেন। এটা বাংলায় লেখা হয়েছিল এবং বিনাপয়সায় বিলি করা হয়েছিল। (যেখানে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লেখা আছে, সেই পুস্তিকা তাঁর দেশবাসী কিনে পড়বেন না, এটা তিনি জানতেন।) **'The Conference between an Advocate for and an Opponent of the Practice of Burning Widows'**– এই নামে বইটার ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

১৮২০ সালে **'A Second Conference'** নামে আরেকটা পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং সেটি লেডি হেস্টিংসকে উৎসর্গ করা হয়। গ্যালিলিওর বইয়ের মতোই এই বইয়ে দু দিকেরই যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে, যা থেকে পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোনটা ঠিক। বিতর্কের একটা নমুনা পেশ করা যেতে পারে। 'এডভোকেট'–এর যুক্তি হল, 'সতী' বিশ্ববাসীর পরিতৃপ্তির জন্য ঘটানো হয় এবং এর ফলে তিনশো পঞ্চাশ লক্ষ বছর স্বর্গবাস নিশ্চিন্ত! এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া হল: ব্যক্তিগত লাভের জন্য যদি কোনো প্রশংসনীয় কাজ করা হয়, তাহলে সেই কাজের গুণ আর থাকে না। এই বিরুদ্ধে যুক্তির স্বপক্ষে 'কঠোপনিষদ' থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল: 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যা অভিনিবেশের দিকে নিয়ে যাওয়া এক জিনিস আর শেষকৃত্য যা ভবিষ্যতে ঈপ্সিত ফললাভের দিকে নিয়ে যায়, অন্য ব্যাপার। প্রত্যেকটির আলাদা পরিণতি— মানুষের প্রবৃত্তি, কোনটা অনুসরণ করবে তা নির্ণয় করে। যে লোক এই দুটোর মধ্যে 'বিশ্বাস'কে পছন্দ করে তিনি আশীর্বাদধন্য; আর যিনি পুরস্কারের জন্য শেষকৃত্যকে প্রাধান্য দেবেন, তিনি স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবেন।'

মহিলাদের প্রতি আর একটু ভাল আচরণের সমর্থনে রাজা জোর দিয়ে বলেছেন যে, স্বাভাবিক ভদ্রতায় মহিলাদের

অস্বীকার করা, তাঁদের উপযুক্ত সুবিধা না দেওয়া, এইসব অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও মহিলারা সাহস ও উদারতার সঙ্গে কাজ করে যান। তাঁর এইরকম বিভিন্ন যুক্তি কেবলমাত্র যে মহিলাদের প্রতি নায্য বিচারের যৌক্তিকতাকে মান্যতা দিয়েছে তা নয়, পুরুষের দুর্বলতার বিরুদ্ধে মহিলাদের শক্তিকেও দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর রচনার যুক্তি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

সামাজিক বড় বাধার মুখে দাঁড়িয়ে 'সতীর' বিরুদ্ধে তাঁর ওকালতির কারণে ব্রিটিশ সরকার যখন আইন করে একে লুপ্ত করল, রামমোহন রায় অসুখী হয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন করা যায় কেবলমাত্র যুক্তি, তর্ক এবং বিশ্বাস দিয়ে, আইনের মাধ্যমে নয়। এই সূত্রে, বর্তমান ক্ষেত্রে পণের কারণে মৃত্যুকে তিনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন?

যদিও আমরা দু শতক আগের থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত বলে দাবি করি, আইন সত্ত্বেও কিছু মানসিক আচরণ আমাদের পাল্টায়নি। তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারেও মেয়ে জন্মালে চাপা আনন্দজ্ঞাপন করা হয়। ছেলে জন্মালে যে আনন্দ করা হয় যা তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। একটা পরিবারে দুজনের প্রতি আচরণ সম্পূর্ণ আলাদা। এই তফাত শুধু তাদের শিক্ষার পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই নয়, তাদের প্রতিদিনের কাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। একজন উজ্জ্বল মেয়ে, যার স্কুলে সব বিষয়ে যোগ্যতা আছে, তাকে তার পূর্ণশক্তি লাগানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহই করা হয়, যেখানে একটা ছেলের ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ এলে বাবা–মা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টাই করেন। ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না, কিন্তু আমার মনে হয়, কেউই আমাদের সমাজের এ ধরনের অসাঙ্গস্য নিয়ে প্রশ্ন করে না। এ ঘটনা জন্মের আগে থেকেই এখন শুরু হয়, কারণ বিবেকবর্জিত কিছু ডাক্তার মহিলা ভ্রূণ সনাক্ত করে তাকে নষ্ট করে ফেলে।

কিন্তু 'বধূহত্যা'র মতো নৃশংসতা আর কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা চলে না। পণ আইন করেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে যখন কথা বলি, তখন এই আইনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। যে আমরা বিধবাদের পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে রামমোহন রায়ের সময়কার ঐতিহ্য–জর্জরিত সমাজের দিকে আঙুল তুলি, সেই আমরাই বর্তমান সমাজকে কী বলব, যেখানে জড়তার জন্য পণের জন্য মৃত্যুকে উপেক্ষা করে? রামমোহন যেমন বলেছিলেন, আইনের চাইতেও সামাজিক ক্ষতিকর অবস্থার বিরুদ্ধে সমাজের সচেতনতা জরুরি।

৬

রামমোহন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উষালগ্নে তিনি চেয়েছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন, মানবিক, উদ্দীপ্ত এক জীবন আনতে, যার একটা অংশ ছিল মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার। তাঁর সময়ে যেহেতু ধর্ম সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, তিনি ধর্ম সংস্কারের পথে গেলেন। ১৮২৩–এ তখনকার হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল এইরকম:

'আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, হিন্দুরা ধর্মের যে বর্তমান ব্যবস্থা মেনে চলে, তা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। জাতিভেদ প্রথা নিজেদের মধ্যে অসংখ্য ভাগ–উপভাগ প্রবর্তন করেছে, যা তাদের দেশাত্মবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। এবং বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কারের বিভিন্ন রীতি তাদেরকে কোনো শক্ত উদ্যোগ নিতে বিরত করছে। অন্তত তদের রাজনৈতিক সুবিধা এবং সামাজিক স্বস্তির কথা ভেবে তাদের ধর্মের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।'

বৈদিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তিত এবং জ্ঞানপূর্ণ সংস্করণ হিসাবে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ভক্তের হৃদয়ে যে বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক হিসাবে যে সার্বজনীন ভগবান আছেন তাঁকে প্রশংসা করে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা সভায় উদ্বোধনী গানটি গাওয়া হোত। ব্রাহ্মসমাজ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল এবং একেশ্বর বা পরম ব্রহ্মকে মানত। যে কোনো জাতি এবং ধর্মের লোকেরা এখানকার সভ্য হতে পারত। প্রাচীন ঋষিরা বিশ্ববোধের যে দার্শনিক তত্ত্ব অভ্যাস এবং প্রচার করতেন, সেটাই ব্রাহ্মসমাজের সমন্বয়সাধনের মূলতত্ত্ব হিসাবে কাজ করত। কাজেই, নিয়ন্ত্রকপ্রথা বা কঠিন ধার্মিক পরিকাঠামোর ঐতিহ্যের বেড়িকে ভেঙে দিয়ে তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, আমরা বর্তমানে আসি। তিনি বর্তমানের রীতি–নীতি কেমন দেখতেন? দু'শতক আগের পূর্বপুরুষদের তুলনায় আমরা কি ভাল অবস্থায় আছি? বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের আলোতেও আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ ধর্মীয় (তা যে ধর্মের দিকে তাকাই না কেন) পুনর্জাগরণের দিকেই ঝুঁকছি। বিভিন্ন সংগঠিত ধর্মের মনোভাব যেভাবে শক্ত হচ্ছে তাতে পরস্পরের হাত ধরার পরিবর্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সরাসরি বিরোধিতার পথে চলে যাচ্ছে। সরকারিভাবে অস্বীকৃত হলেও জাতপাতের ব্যাপার এখনও প্রকট। যদিও এটা হিন্দুধর্মের

বৈশিষ্ট্য হিসাবেই ধরা হয়, কিন্তু এর প্রভাব অন্য ধর্মেও দেখা যায়! কারণ, যদি কেউ হিন্দুধর্ম থেকে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হন, সামজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনি কিন্তু জাতের উত্তরাধিকারই বহন করেন।

প্রকৃতপক্ষে, 'অনগ্রসর শ্রেণী' এবং 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী'– সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এইসব সূক্ষ্ম পরিবর্তনেও জাতপাতের জোর পড়ে। রামমোহনের জাত-জর্জরিত সমাজ নিয়ে যে উদ্ধৃতি একটু আগে দিলাম, সেটা কি বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য নয়? বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজা হতাশায় তাঁর হাত ছুঁড়তেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথাকথিত শিক্ষিতদেরই আলোকিত করতে না পারে, বৃহৎ সংখ্যক নিরক্ষর নাগরিকদের আমরা কী বলতে পারি!

৭

বর্তমানে যে শব্দবন্ধটি বেশি ব্যবহৃত হয়, যা রাজার সময়ে ছিল না অথচ তিনি তাঁর অনেক বক্তৃতা ও লেখায় এর জন্য ওকালতি করেছেন, তা হল 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা'। রামমোহন, তাঁর যুক্তির প্রচারে এবং চিন্তার স্বাধীনতায় যুক্তিবাদী ছিলেন। তাঁর সময়ের পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে ধর্মকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ইচ্ছেই তাঁকে ধর্ম ও তার কঠোর নির্দেশের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে বাধ্য করেছিল।

বর্তমানে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রচণ্ড গতিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঢুকে পড়ছে, তখন এই মানসিকতা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। রামমোহন রায়ের সময়ে যে বিচ্ছিন্নতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ছিল, মোবাইল, ফ্যাক্স, ইলেক্ট্রনিক মেল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির সাহায্যে যে তথ্য-বিস্ফোরণ হয়েছে, তাতে সেই দূরত্ব ঘুচে গেছে। বলা হয়, তথ্য অধিগত করার ফলে আমাদের চিন্তা ও জীবনযাত্রায় বিপ্লব এসেছে। তথ্য-অজ্ঞানতা দূর করে, এইরকমই ভাবা হয়। এই অজ্ঞানতা দূরীকরণ কি আমাদের দেশে ঘটে? আমি কয়েকটা ঘটনা বলতে পারি যেখানে এই সব প্রযুক্তির ব্যবহার সত্ত্বেও ভুল তথ্য ও কুসংস্কারের মুঠো আমাদের সমাজের ওপর খুব শক্তভাবে রয়েছে।

আমার পুনা কেন্দ্রে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার গবেষণার সুবিধার জন্য আধুনিকতম কম্পিউটার প্রযুক্তি আছে। এখানে ইলেক্ট্রনিক মেল, আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট দ্রুত অধিগত করা, পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদান করা, এবং অবশ্যই অত্যাধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত সফ্‌টঅয়্যার যা তত্ত্ব এবং তথ্যের মেলবন্ধন করতে জরুরি- এইসব আধুনিক ব্যবস্থা আছে। পুনার একজন শিক্ষিত ভদ্রমহিলাকে আমি একদিন এইসব বোঝাচ্ছিলাম। তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এখান থেকে কি কম্পিউটার-কৃত কোষ্ঠী পেতে পারি?'

জ্যোতিষচর্চার নামে যে অবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞান চলছে, যার প্রভাবে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁর জীবন জন্মছক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— এর বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারিনি। পরিসংখ্যান বলে, জন্মছকের সঙ্গে কোনো দম্পতির বিবাহোত্তর জীবনের গুণমান কেমন হবে তার কোনো সম্পর্কই নেই। তাও বিয়ে স্থির করার আগে জন্মছক মেলানো একটা সাধারণ অভ্যাস। এটা যে শুধু নিরক্ষর লোকজনের মধ্যেই আছে তা নয়, উচ্চশিক্ষিত এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও আছে। মানুষের জীবনে গ্রহদের প্রভাবের কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ বা প্রায়োগিক নজির না থাকা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন মন্ত্রিসভা গঠন, নতুন ঘরে প্রবেশ বা নতুন গাড়ি কেনা, নতুন ব্যবসা শুরু করা— প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই শুভ বা অশুভ সময়ের হিসাব করা হয়।

আমাদের শিক্ষিত সমাজে তথাকথিত 'বাস্তুশাস্ত্র' নামে এক নতুন পাগলামো শুরু হয়েছে। এই শব্দবন্ধটির মানে স্থাপত্যের বিজ্ঞান। বাস্তবে, স্থাপত্য বা বিজ্ঞানের নামে এটা যায় কিনা সেটাই প্রশ্নের। স্থপতি বা বৈজ্ঞানিকেরা এর ঋণাত্মক উত্তর দেবেন। তবুও একটা ধারণা তৈরি করা হয় যে, জীবনের সামগ্রিকতার বিচারে এবং সাফল্যময় জীবন নিশ্চিত করার উদ্দেশে কোনো একজনের বাড়ি নির্মাণের

ক্ষেত্রে কয়েকটা নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা উচিত। রান্নাঘরের জানলার মুখ কোনদিকে হওয়া উচিত, শোবার ঘরের দিকটা কোন অভিমুখে হবে, কটা সিঁড়ি বাড়িতে থাকতে হবে, ইত্যাদির সঙ্গে নাকি আমাদের স্বাস্থ্য, বিত্ত, বিবাহিত জীবন, দীর্ঘ জীবন ইত্যাদির যোগাযোগ আছে। সমাজের বিশিষ্ট স্থানে থাকা মানুষেরা 'বাস্তুশাস্ত্রের' নিয়ম মেনে বাড়ির কিছু অংশ ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, জনগণের টাকায় এই পরিবর্তনগুলো করা হচ্ছে। এই নিয়মগুলোর কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ কিন্তু নেই, তাও তোমার ভাল থাকার জন্য বেশি খরচে এইগুলো ভাঙতে হবে এইরকম একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে। রামমোহন রায়ের অনুগামী যুক্তিবাদীরা যখন এই মতবাদের বিরোধিতা করলেন, তাঁদের আপত্তি গ্রহণ করা হল না।

একটা ভুল তথ্য কীভাবে শুধু দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তেই নয়, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে খুব

দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ঘটনা আমি বর্ণনা করতে চাই। আমি প্রভু গণেশের দুধ খাওয়ার খবরের কথা বলছি। ভাবছি, রাজা রামমোহন রায়, তাঁর মূর্তিপূজোর সমস্ত বিরোধিতা নিয়ে এই ঘটনায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন! বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জায়গায় হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, এই ঘটনায় অসাধারণ বা অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। আসল অলৌকিক ঘটনা হল, যে পদ্ধতিতে এই খবর ছড়িয়েছিল: এটায় কোনো স্বর্গীয় অলৌকিকতা ছিল না, এটা ছিল তথ্যপ্রযুক্তির ফলাফল, যা আমি আগে বর্ণনা করেছি।

এই ঘটনাগুলো আমাদের বলে যে, রাজা যেসব সেকেলে ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, দেশ হিসাবে আমরা সেইরকমই অন্ধকার সময়ে বাস করছি। উচ্চ প্রযুক্তির নীচে ছদ্মবেশে সামাজিক কাঠামো তাঁর সময়ের মতো সঙ্কীর্ণমনাই আছে।

৮

ইউরোপের শিল্পবিপ্লবে উৎপন্ন প্রযুক্তি ভারতে আনা হয়েছে– ব্রিটিশ শাসনের এই কৃপাময় মুখটাই অনেকসময় উপস্থিত করা হয়। এইভাবে ব্রিটিশরা শিল্প, ভাল রাস্তা, রেল, টেলিগ্রাফ, ইত্যাদি এনেছে। রামমোহন এইসব সুবিধাগুলোর সমঝদার ছিলেন যদিও তাঁর সময়কালে এগুলো অস্পষ্ট ছিল। এসবসত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশ আইনের অসম বাণিজ্যনীতির নামে শোষণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কোনো বিদেশি সংস্থাই লোকহিতকর চিন্তাধারা নিয়ে দেশে প্রবেশ করবে না তা তিনি জানতেন। যে প্রযুক্তি ব্রিটিশরা দেওয়ার প্রস্তাব করছে এবং বিক্রি করছে সেটা ভারতের পুঁজি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবার জন্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সহৃদয় কর্মচারী বলেছিলেন, লন্ডনে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে কয়েক বছর বাৎসরিক প্রেরিত অর্থ প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ডের মতো পড়ত।

তাঁর সময়ে তর্কটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক একাধিপত্য বনাম মুক্ত বাণিজ্যের। রামমোহন রায় এবং তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে ছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, মুক্ত বাণিজ্যের ফলে ভারতের বদ্ধ উন্নয়ন ইউরোপিয়ানদের নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে গতিশীল হবে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যাতে শিল্পের প্রসার হয় তার জন্য তাঁরা উৎসাহ দিতেন। ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে হাত মেলালে শোষণও আসবে, এই বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন। কিন্তু দেশের শিল্পায়নের সুফল এই শোষণকে ভারসাম্য করবে যা ভারতকে পৃথিবীর মানচিত্রে একটা জায়গা দেবে— এটা তাঁরা বুঝেছিলেন।

তাঁর সময়ের তর্কের প্রতিধ্বনি দেখা যায় বর্তমানে উদারীকরণ এবং মুক্ত বাজার–অর্থনীতি বনাম রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির তর্কে। আমি অর্থনীতিবিদ নই, কাজেই বর্তমান তর্ক সম্পর্কে মন্তব্যে বিরত থাকব। কিন্তু আমার মতো একজন কিছু না জানা লোকও, যে বিষয়গুলো নিয়ে তখন এবং এখন তর্ক চলছে, তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাবে। আমরা কি বহুজাতিক সংস্থাকে পুরোপুরি দেশের বাজার খুলে দেব এবং ঝুঁকি তারা নিজেদের কাজে লাগাবে, নাকি অর্থনীতিকে আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে? রাজা যদি এখন থাকতেন, নিশ্চিতভাবেই এই তর্কে তাঁর একটা দৃঢ় মত থাকত।

৯

আরেকটা সমসাময়িক বিষয় যা তখন এবং এখন বিতর্কের বিষয় হিসাবে উঠে আসছে, যেখানে রামমোহন রায় ব্যক্তিগতভাবে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেটা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সাধারণভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। তাঁর সময়ে, সংবাদপত্র শুধু যে খবর সরবরাহ করত তাই নয়, সমসাময়িক বিষয়ে মতামত প্রকাশ এবং তৈরি করতেও সাহায্য করত। স্বাভাবিভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ এই সব কাগজের খবর এবং মতামতের বিষয়বস্তু ছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তাব্যক্তি এবং খবরের কাগজের সম্পাদকের মধ্যে এই নিয়ে দড়ি টানাটানি চলত। একটা স্তরে, ১৭৯৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করতে এক আইন জারি করলেন। এই আইনে প্রকাশনের আগে কোনো খবর এবং মতামত সরকার পরীক্ষা করবে এবং অনুমোদন দেবে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনগুলোর কঠোরতা কমে গেল। কিন্তু বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণ থেকে গেল। এই অবস্থায়, জেমস সিল্ক বাকিংহাম 'ক্যালকাটা জার্নাল' নামে একটা কাগজ প্রকাশ করলেন যা বাক–স্বাধীনতার পক্ষে লাঠি ধরল। রামমোহন রায়, যদিও বাকিংহামের মতো অত কঠোর সমালোচক ছিলেন না, একই ধরনের মতামত পোষণ করতেন এবং তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। পরে, তিনি দুটো কাগজ প্রকাশ করেন, বাংলায় 'সংবাদ কৌমুদি' এবং ফার্সিতে 'মিরাত–উল–আখবর'– যে দুটো ভাষাই তিনি খুব ভাল জানতেন। তিনি সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় ভারতীয়, হিন্দু এবং মুসলমানদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই কাগজ দুটিতে প্রচার করতেন।

আবার এখানেও, আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে পাই, যিনি সময়ের অনেক আগে এগিয়ে ছিলেন, সংবাদমাধ্যমকে মতপ্রকাশের একটা যন্ত্র হিসাবে দেখেছিলেন, সামাজিকভাবে

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছিলেন এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের মনে একটা জাগরণের বীজ বপন করেছিলেন।

গণমাধ্যমের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় এই বিষয়গুলোর সংজ্ঞা বর্তমানে প্রসারিত হয়েছে। সংবাদপত্র— যা রামমোহনের সময় ছিল, এখনও আছে; কিন্তু বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম যেমন টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি সংবাদপত্রকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সরকার কতদূর পর্যন্ত তথ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? তথ্য এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র, সব সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতে পারে— এটা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই যদি সরকার কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে, রায়ের মতো লোকের যে দরকার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেহেতু বর্তমানে তথ্য বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো অনেক সহজ, আমার সন্দেহ, নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে গণমাধ্যমের চারপাশে একটা লোহার পর্দা দিতে হবে।

১০

সংক্ষেপে, ইতিহাসের পাতায় রামমোহন রায়ের যে গুণগুলো জানা যায়, তাঁর সময়ের মতো বর্তমানেও সমান প্রাসঙ্গিক। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুগের সাথে রামমোহনের সময়কালের এই সাদৃশ্য আপাতভাবে বিস্ময়কর মনে হতে পারে কারণ বর্তমান তাঁর সময় থেকে অনেক পরিবর্তিত বলে ভাবা হয়। কাজেই কেউ কেউ ভাবতে পারেন তাঁর সময়ের চিন্তাধারা বর্তমান যুগে অচল। তা কিন্তু নয়! তিনি শিক্ষায়, সামাজিক সংস্কারে, যুক্তিবোধ্যতায়, মুক্ত বাণিজ্যে, বাক-স্বাধীনতায় যে চিন্তা প্রয়োগ করেছিলেন তা সেদিনের মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। অবশ্যই, একজন যখন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পর্যালোচনা করেন, তিনি কিছু স্ববিরোধ এবং ভুলত্রুটি দেখতে পাবেন। দেশপ্রেমীরা, তাঁর, দেশের নতুন বিজয়ীর প্রতি নরম মনোভাব পছন্দ করেন না। যখন সামন্ততান্ত্রিক নয় এমন পরিবেশের জন্য জোর দিচ্ছেন, সেইসময়ে তিনি নিজে অভিজাত জীবন কাটাচ্ছেন।

যখন কিছু বর্ষ–প্রাচীন ধার্মিক সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন, তিনি নিজেই কিছু সংস্কার ছাড়তে পারছেন না। সতীপ্রথার রিরুদ্ধে প্রচার চালালেও আইন পাস হবার পর তিনি অখুশী হয়েছিলেন। তাঁর কিছু আচরণ সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে তিনি বড় হয়েছেন এবং ওখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বাস্তবে কেউই নিখুঁত নয়। একজন, তার সময়ে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা কীভাবে মোকাবিলা করছে এবং কীভাবে অকপটে এবং অনবরতভাবে ভালর জন্য তার বিরোধিতা করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলেছেন তা তুলে দিচ্ছি: 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি, বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।'

রবীন্দ্রনাথ এটা ১৮৮৪ সালে তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন। এক শতাব্দীর বেশি সময় পরেও আমি মনে করি, এই অসাধারণ মানুষের প্রতি এর চেয়ে ভাল শ্রদ্ধার্ঘ্য হতে পারে না।

অনুবাদ: প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার **ফোন নম্বর**: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ -১২৬৩৭।

এই গরমে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

জল নিয়ে অনেকেই ভাবছেন। ভাবনার বহু কারণ। বিশেষ করে নীতীশকুমার ও শেখ হাসিনা দু দিক থেকে যেভাবে আমাদের পানিপীড়নে লেগে পড়েছেন ও আমাদের গাঁয়ে-গাঁয়ে জলের তল, জোগান ও মান দিনদিন যেভাবে কমছে, তাতে জলের বিষয়ে আমার মতো একেবারে নবিস লোকেদেরও একটু কথা বলা দরকার হয়ে পড়ছে।

সেই দূর শিশুকালে 'জলই জীবন'— এই রচনা আমরা সকলেই কমবেশি লিখেছি। নবযুগে আজ ঠাহর হল, জলই মরণ। হিসেব বলছে, আমাদের দেশে এখন বছরে মরণের হার হাজারে আট (২০১০)। এই আটের আধাআধি (৪.২) মরেন জল বা পরিবেশের নানারকম বিষ ও জীবাণুর কোপে। হিসেব একটু খতিয়ে ঘাঁটলে বোঝা যায়, মরণে জলের ভূমিকা এদেশে সবথেকে বেশি। এ যোগাযোগটা সরাসরি বোঝা যায় আধমরাদের হিসেবে। এই বাংলায় এখন (২০১৫-১৬) রক্তাল্পতায় (অ্যানিমিয়া) ভুগছেন শতকরা ৬৫ জন ১৫-৪৯ বয়সী নারী। এই আধমরাদের যে আধমরা ছেলেপুলে হয় (৬-৫৯ মাস) তাদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার হার ৫৪। এঁদের নতুন বিয়োনো শিশুদের কম ওজনের হার ৩১ (এনএফএইচএস-৪। ঠিকমতো খেতে না-পাওয়া বা খাবারের বিধি না-জানা; কৃমি, ময়লা পরিবেশ, লেখাপড়া না-জানা, মাঠে যাওয়া— এই রকম নানা কারণে অ্যানিমিয়া বাড়লেও চোখ খুললেই গাঁয়ে ও মাঠে চারিদিকে যে ডিগডিগে ও চিমসের দল আমরা দেখতে পাই, তার বড় কারণ এদেশের জলের হাত ধরে বারবার করে শরীরে ঢোকা নাছোড় অসুখগুলো। জল তাই যেমন আমাদের জীবন। জল তেমনই আমাদের মরণও। জল না খেয়ে আজকাল কেউ মরে বলে কম শুনি, এখন লোক মরে জল খেয়ে!

মেয়েদের রক্তে লালকণা কমানোর পেছনে ভুল জলপান, বিষজলে চান ও মুখ ও হাত-পা ধোয়া, বাসনমাজা, শাক-তরকারি ধোওয়া— সব কিছুরই 'অবদান' আছে। এখন সরকারের শৌচাগারে মন লেগেছে, খুবই ভালো কথা। তবে পায়খানায় জল না জোটালে, বাঁ-হাতের ব্যবহার দূর করে নলধৌতি (কমোড শাওয়ার) না বাড়ালে, ভারত আদপেই সাফ হবে না। জল ছাড়া শৌচাগার মানুষকে অশৌচই করে। জল চাই। নলধৌতি চাই। সাবানও চাই। ভোটের আগে চারিদিকে 'জল দিব, জল দিব' রব উঠেছে, তবে মানুষটা যেন পায়খানার ভেতর থেকে ঠিকঠাক সাফ হয়ে তবেই বেরোয়। জল দিতে হবে রাঁধবার ঘরেও। চানের ঘরেও। বিশেষ করে মেয়েদের। লোকগণনার (২০১১) হিসেব দেখছি, এ বাংলায় বাড়িতে পানীয় জল আছে ৩৯ শতাংশে। বাড়ি থেকে দূরে আছে ২৭ শতাংশে। বাকি ৩৪ ভাগ জলহীন অথবা তাদের জল বহুদূরে। অনেকেই এখনও অপেয় জল খান। এসব শুধরে চলেছে বলে সরকার চারিদিকে বলে চলেছে। সরকার জলটুকু ঠিকমতো দিয়ে তারপর কথাটথা কইলে মানুষ একটু কম মরতে পারে, এটুকুই আমাদের বলবার। তেমনই সরকারের জল বিকেলে কল থেকে পড়েই যায়, পড়েই যায়; পড়ে- পড়ে তিরিশ মিনিটে জল ফুরোয়; ছেলে-বুড়ো আমরা কেউ দেখি না। চারিদিকে, আর নিজেকে বলতে হবে যে এটাও সভ্যতা নয়। কলকাতায় এখনও বাসিজল সকালে ফেলা হয়।

আবারও বলি, নলধৌতির আয়োজন চাই সব মানুষের শৌচাগারে। তাহলেই ঠিকঠাক শৌচকাজ হয়েছে বলা যাবে। শেষ হিসেবে শৌচাগার হয়েছে এ বাংলায় ৫১ ভাগ ঘরে (২০১৬ এনএফএইচএস-৪)। দিন-দিন শৌচাগার বাড়ছে। ভালো কথা। ধৌতির হিসেব দেশে এখনও কেউ রাখে না। সেটা কেন দরকার, সেই বোধও কম। এসব বুঝিয়ে-সুজিয়ে চালু করতে গেলে সরকার ও মানুষদের যৌথভাবে আরও লাগা দরকার। জল নিয়ে বহু গুণী মানুষ লিখেছেন। বহু

খবরও বাজারে চলে। এখানে আমরা দরকারি খবরগুলো জোগাড় করে কোনদিকে যাওয়া দরকার সেটা একটু ধরতে চাইছি।

একজনের কতটুকু জল চাই? একসময়ে হু (ডব্লুএইচও) বলছিল, দিনে মাথাপিছু ৭০ লিটার জল চাই। এই গরম, ধুলো ও বেশি জীবাণুর দেশে দিনে মাথাপিছু পাঁচ বালতি বা ১০০ লিটার জলও বৈশাখে কম হতে পারে। এই ১০০ লিটার ধরে আমরা হিসেব করে দেখেছি, ঐ জলের চার আনাও এখন এ বাঙলায় মানুষের কাছে নেই। তবে এটাও হিসেবে দেখা যায়, ঐ পরিমাণ জলও জোটানো যাবে যদি এ কাজে সরকার ও নাগরিক সকলে একমত হয়ে লাগে। জলসচেতনতা চাই। কলকাতায় ও ছোটো সব শহরে ও বড় বাড়িঘরে বাদলজল মানে বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখার কড়া নিয়ম চাই। এটা আজ হবে, কাল হবে বলে এখনও হয় নি। মানুষও পরিবেশসচেতন হয়ে বেশি এগোয় নি। নদীয়ায় ২০০৯ নাগাদ হিসেব করে দেখা গেছে, বাদলজলে বছরে কমবেশি ৪৫ দিন ধোয়া-মোছা ও শৌচের কাজ চলে। ঠিকমতো ধরতে পারলে এ জল খাওয়াও যায়। হাওড়া, নদীয়া, টাকি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, ময়না, বীরভূম, বারাসাত ও হাসনাবাদের জলাগুলো খুঁড়ে সাফ করা দরকার। পানা সরিয়ে জলে রোদ লাগতে দেওয়া দরকার। তাতে জীবকণা আলো পেয়ে অক্সিজেন ছাড়বে ও মাছ বাড়বে। জলের দূষণও কমবে। মাটির উপরের জলটা আমরা গাঁয়ে গাঁয়ে দিতে পারি ৩-৪ মাস। এই জলে আর্সেনিকের বিপদ কম। একশো দিনের কাজটা কাজে লাগিয়ে এই ৩-৪ মাস সময়টা বাড়িয়েও নেওয়া যায়। ভাগীরথী আমাদের কমবেশি চার কোটি লোককে বারোমাস জল দেয়। বিহার ও তার উপরের রাজ্যগুলো সেই জলহরণের হার যেন একটু কমায় তা নিয়ে লোকসভায় রাজনৈতিক কলরব হওয়া দরকার। ভাগীরথী থেকে অভাগা এই বাঙলার জোটে বিহারের নালার জল ও নেপালের নদীর জল। সেটাই আমরা তুলে থিতিয়ে ক্লোরিন দিয়ে খাই ও বারোমাস রোগে ভুগি। ভাগীরথীর এই বেতিখাল ও পয়োনালির জল দশ বছরের পরে ক্লোরিন দিয়েও পানযোগ্য করা যাবে না বলে কোনো কোনো গবেষক লিখেছেন। এদিকে আমাদের যে জল নেই; কলকাতা যে পয়োনালির জল খায়, একথা পরিবেশ-সচেতন গোটা কয়েক পাগল ছাড়া দেশে কেউ বলেন না, কেউ জানেনও বলে মনে হয় না। যে বাঙালিদের গলায় ও কলমে জোর আছে, তারা কোথাও কেউ চেঁচিয়ে বলে না যে, আমাদের জল নেই। বাংলাদেশের থেকে জলের হাহাকার আমাদের অনেক বেশি। আমাদের পুরুলিয়া বাঁকুড়া দূরে থাকুক। নলহাটি, হেমতাবাদ, চাপড়া, ইসলামপুর, রায়দীঘি বা গাজলের মানুষের পান চান চাষের জলযাতনা রংপুর থেকে কম নয় অনেক বেশি।

এছাড়াও আমাদের কল ও নলের জলে জীবাণুরা আছেই। এটা শহরে ক্লোরিনের কল্যাণে কমছে, বাইরে কমেনি। এ আপদ সামলাতেও মানুষের বোধের উদয় হওয়া চাই। জীবাণু থেকে বাঁচবার সহজ উপায় সারা বছর রোদপোহানো জল খাওয়া। গুণীরা বলেন, রঙহীন কাচের বোতলে দু-তেহাই কলের বা নলের জল ঢুকিয়ে ভালো করে কুড়িবার ঝাঁকাতে হবে। তারপর নল বা কলের জলে বোতল ভরে ছিপি আটকে সারাদিন বোতলের গায়ে রোদ লাগতে দিতে হবে। মেঘলা আকাশের আলোতেও কাজ হবে। তাপ, অতিবেগুনি আলো ও বাড়তি অক্সিজেন জলশোধন করে। রোদেপোড়া হলে, গুণীরা বলছেন, জীবাণুরা অকেজো ও বিকল হয়ে পড়ে। এভাবে খরচ ছাড়াই জল নিজের ছাদে বা চালায় শোধন করে পানের যোগ্য করে নেওয়া যায়। ইউনিসেফ, হু, ডেভিড ওয়ারনার ও আমাদের সুনীতিবাবুও (সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানলেখক সুনীতিকুমার মণ্ডল) রোদপোহানো জলকে নিরাপদ বলেছেন। ইন্টারনেটে এ বিষয়ে অনেক চুলচেরা গবেষণার তথ্য দেখা যেতে পারে। সাতটা একলিটারি কাচের রঙহীন বোতল ও একচিলতে আকাশ জোটাতে পারলে পাঁচজনের পরিবারের খাবারজল, (বোতল বাড়ালে মুখ ধোবার জলও) জোটানো যায়। যত সব অদামি-কুদামি মেশিন না কিনলেও চলে। আজ অবধি আমরা যতটা জেনেছি, তাতে এটা গাঁয়ে ও শহরে বলবার মতো একটা সহজ উপায়।

বাঙলাদেশে শাড়িতে আটটা ভাঁজ করে তা দিয়ে জল ছেঁকে তাঁরা এসব দূষিতজলের মান বাড়াতে পেরেছেন। গুণীরা লিখেছেন, তাতে কলেরা কমেছে। নেটে খবর আছে। জৈনরা জলজ পোকা বাঁচাতে এপথ ধরেছিলেন বহু আগে, তাতে পোকা ও মানুষ উভয়ের শরীরই বাঁচত। এ নিয়ে বিদেশেও গবেষণা হয়েছে। যেখানে আর উপায় নেই, কোনোভাবেই জল মেলে না, সেখানে এটাও পথ। আমরা ঐ কিশোরীর গাঁয়ের লোকেদের এসব কথা যতটা পারা যায় বলেছি, তবে বিশেষ কাজ হয়নি। পুকুরে নামা ঠেকানো কঠিন। এ কাগজের পাঠকেরা গরমে ঐ গাঁয়ে দিনের পরে দিন থাকলে ঐ পুকুরেই নামবেন। লেখকও নামবেন।

ভাগীরথীর জল হরণ করা আমাদের রাজধানীতে ও ঢাকায় এসব খবর পৌঁছনো দরকার যাতে ভারত ও বাংলাদেশের সভাসদরা এ বাঙলার যাতনাটা বুঝতে পারেন। ঢাকা এ

বাঙলার জলযাতনার কথা আদৌ জানে বলে মনে হয় না। তাদের বলা হয়েছে, কলকাতায় জাহাজ আনবার জন্য আমাদের জল চাই। জাহাজ নেই গত ১৫ বছর। আর কখনও আসবেও না। আমাদের খাবার জলও নেই। এ বাঙলা বেশি শুকনো। সব শাখানদী শুকিয়ে কাঠ। এখন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বহু গাঁয়ে, গাজলে, মেদিনীপুরে ও আবাদ এলাকায় ঐ জৈন মহাজনী পথ ছাড়া চান ও পানেরও কোনো উপায় থাকে না বছরে তিন-চার মাস। যাঁরা গাঁয়ে ঘোরেন বা থাকেন, তাঁরা জানেন।

৩০ মার্চ ২০১৫, জল নিয়ে কলকাতা এম্পাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশনের কর্মশালায় গাঁয়ের যোগদানকারীদের মতামত।

১. শিপ্রা দাসমাইতি, খঞ্চি, বাসুদেবপুর, পূর্ব মেদিনীপুর— আমাদের পুকুরগুলো ছোটো, গরমকালে জল কমে নোংরা হয়ে যায়। অনেকেই খালের জলে স্নান করে, বাসনপত্র ধোয়, জামাকাপড় ধোয়। কয়েকটি জায়গায় সজলধারা থাকলেও বেশি জায়গায় নেই। বেশিরভাগই টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করতে হয়। তবে পাম্প করতে এতই অসুবিধা যে, কোনোরকমে খাবার জলটাই নিয়ে যাওয়া যায়। সজলধারাকে আরও বড় করে গ্রামের মধ্যে আনা দরকার।

২. অণিমা গিরি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রধান, বিষ্ণুপুর, পিছাবনি, পূর্ব মেদিনীপুর— পুকুরের জলে জমিচাষ হয়। কাছাকাছি নলকূপের ব্যবস্থা নেই। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জল আনতে যেতে হয়। জল সারাদিনে দু ঘণ্টা আসে এবং কারেন্টের উপর নির্ভর করতে হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলে আমাদের খুব সুবিধা হয়।

৩. ভারতী মুরমু, রাঙ্গামেট্যা, বাঁকুড়া— পুকুরে চানের জল নেই। গ্রামে তিনটি টিউবওয়েল আছে, দুটি খারাপ। ছোট কুয়ো ও বড় কুয়ো মাত্র দুটি আছে, তার জল খাওয়ার অযোগ্য। এখানে নদী থেকে জল তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। টিউকল, কুয়ো ও পুকুরের সংখ্যা বাড়াতে হবে যেন সারাবছর জল থাকে।

৪. মামণি কর, শ্যামলী কর, রীনা মুন্ডা, নগেন্দ্রপুর আদিবাসীপাড়া, রায়দীঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা— কোনো বড় পুকুর নেই, সমস্ত পুকুর ছোটো। গরমের সময় জল থাকে না। এলাকায় একটাই টিউবওয়েল। টিউবওয়েল খারাপ হয়ে গেলে স্যালোর জল ব্যবহার করে। পুকুর কাটিয়ে বড় করা ও টিউবওয়েল চাই, যাতে সবসময় জল পায়।

৫. মৌমিতা সাঁতরা ও সরস্বতী কাপড়ি, পুয়্যাদা, পদুমখানা, পূর্ব মেদিনীপুর— গ্রামের সজলধারা প্রকল্পে প্রতিটি বাড়িতে সজলধারা রয়েছে, তবে সকাল ৭-৩০ মিনিটে ও বিকেল ৩-৩০ মিনিটে আধ ঘণ্টা জল পাওয়া যায়। বাচ্চারা ও অভিভাবকেরা জলাভাবে খালের জলে স্নান করে। খালের জলেই শৌচকর্ম ও বাসনধোয়ার কাজ করে। জলাশয় একটা-দুটা আছে, নোংরা।

কোন খবর, কোথায় পেলাম—

ক. মরণের হার: Encyclopaedia Britannica 2013, Book of the year, Nations of The World: India, p.623.

খ. অ্যানিমিয়ার খবর: National Family Health Survey-4, 2015-16, State Fact Sheet, West Bengal, International Institute for Population Sciences, Mumbai। নেটে পাবেন।

গ. বাড়িতে পানীয় জলের হিসেব: Government of India, Census data 2011 ও An Uncertain Glory India and its Contradictions, by Jean Dreze and Amartya Sen (2013): Statistical Appendix, part 12: Household amenities.

ঘ. রোদপোহানো জল: ডেভিড ওয়ারনারের মতটা আছে 'যেখানে ডাক্তার নেই', অনুবাদ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৯, পৃঃ ২০৭। নেটে অনেক লেখা মিলবে। Solar disinfection of drinking water শিরোনামে খোঁজা যেতে পারে।

উমা

নতুন দুই বই

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

বন্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে উৎস মানুষ প্রকাশ করল নতুন দুটি সঙ্কলনগ্রন্থ।

গঙ্গাব্রতীর জীবন গেল মলিন রয়ে গেল গঙ্গা!

মেধা পাটেকার ও সন্দীপ পাণ্ডে

দীর্ঘ অনশনে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পুলিস দিয়ে জোর করে জি ডি অগ্রবালকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইমস–এ।

আমরা যেখানে প্রতিদিন নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, সেই সময় একজন শুধু গঙ্গাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনই দিয়ে দিলেন! আমরা হয়ত তাঁকে বোকার হদ্দের দলেই ফেললাম। কিন্তু যিনি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরের পাতন' তত্ত্বে বিশ্বাস রেখে সত্যিই জীবন দিলেন তিনি, নিছক কোনো বোকাহাঁদা মানুষ ছিলেন না। কিশোরদের মগজধোলাই করে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। গুরুদাস অগ্রবালকে তেমন আবেগচালিত কিশোরদের দলেও ফেলা চলে না। তিনি পরিণত বয়স্ক এবং আমাদের দেশে যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সেখান থেকে পাস করা মানুষদের দেখে সমীহ জেগে ওঠে, তিনি তেমনই এক প্রতিষ্ঠানের কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন সরকার নিজেই যখন গঙ্গা বাঁচানো নিয়ে এত বড়বড় কথা বলছে, উদ্যোগী হবে, তাঁর কথা শুনবে। না, চোরা ধর্মের কাহিনী শোনে নি। খানিকটা অভিমান থেকেই হয়ত তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। আমাদের বিবেককে একটা ধাক্কা দিতে চাইলেন। অবশ্য আমাদের বিবেক নামক বস্তুটা আছে কিনা তা নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও কিছু বলার থাকবে না। **সম্পাঃ**

গঙ্গাব্রতী গুরুদাস অগ্রবালের নিধন প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের মন্দির বেদিতে আর একটি প্রাণের বলিদান। শহিদ এই বিজ্ঞানীকে যাঁরা প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান তাঁদেরকে অবশ্যই প্রকৃতি ধ্বংসকারী ছিন্নমস্তা উন্নয়নের পূজারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়ে সহযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

মেধা পাটেকার ও সন্দীপ পাণ্ডে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রথম সদস্য সেক্রেটারি হিসাবে নিয়োজিত প্রবাদপ্রতিম

বিজ্ঞানী গুরুদাস অগ্রবালই ভারতের দূষণ বিরোধিতার জমানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনিই বিফল হলেন বর্তমান ভারত সরকারকে গঙ্গানদীর পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব পালনের পথ গ্রহণে দৃঢ়নিবদ্ধ করতে। অবশেষে এই বিফলতার আবহেই তিনি নিজের জীবন দিলেন।

অধ্যাপক অগ্রবাল বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি। তিনি সুখ্যাত কানপুর আইআইটি–তে অধ্যাপনা করতেন। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার দাবিতে ২০১৮–র ২২ জুন অনশন শুরু করেন। টানা অনশনের ১১২তম দিনে অক্টোবরের ১১ তারিখে তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। কয়েক বছর আগে হিন্দুধর্ম অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর নামকরণ হয় স্বামী জ্ঞানস্বরূপানন্দ। এটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না যে, যে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতার গদিতে এল,

সেই সরকারই কিনা একজন হিন্দু সাধুর নদী সম্পর্কে পরিবেশ ও ধর্মের বিচার বোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে কর্ণপাত করল না! যে বিষয়টি আবার স্বয়ং নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচারের একটি মুখ্য অঙ্গ ছিল!

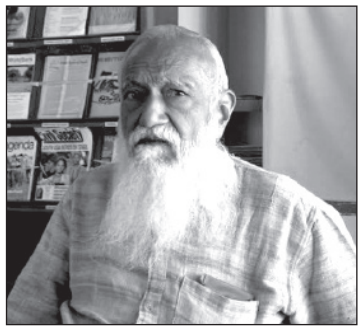

২০১২ সালে 'জাতীয় নদী গঙ্গাজি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা)' নামের আইনি একটি খসড়া গুরুদাস পেশ করেন। ২০১৭ সালে (এনডিএ) সরকার 'জাতীয় নদী গঙ্গা (উজ্জীবন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা)' নামে একটি বিল তৈরি করে নতুন রূপ দেয়। বিষয়বস্তুর বিচার অনুযায়ী এই দুটি খসড়া বিলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে।

গুরুদাস অগ্রবাল গত ৫ আগস্ট গঙ্গার পরিবেশ নিয়ে তাঁর পালিত ষষ্ঠ এবং অন্তিম অনশনের সময়ে মোদিজিকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে লিখেছিলেন, মোদিজিদের সরকার সাড়ে চার বছর ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও গঙ্গার সংরক্ষণের জন্যে কোনো করণীয় কাজই করে নি। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে তাঁর পূর্ববর্তী মনমোহন সিংয়ের সরকার তাঁর তোলা দাবিগুলি পূরণের জন্য আরও বেশি পরিমাণে সাড়া দিয়েছিলেন। গুরুদাস চিঠিতে লেখেন যে, মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে জাতীয় পর্যাবরণ বিষয়ক আবেদন বিচারকারী কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাপিলেট অথরিটি) উত্তরাখণ্ডের লোহারি নাগপলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরব্ধ কাজও বন্ধ করে দেয়। তা ছাড়াও গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথের ১০০ কিমি লম্বা অংশকে সংবেদনশীল পর্যাবরণ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। যার অর্থ ওখানে যে কোনও ক্ষতিকারক কর্মপ্রকল্প নিষিদ্ধ হয়েছিল।

তিনি তাঁর চারটি দাবিকে পুনরায় তুলে ধরলেন। অনশনের আগেই এই দাবিগুলি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রেখেছিলেন। দাবিগুলি হল': ১) গুরুদাস অগ্রবাল নিজে এবং অ্যাডভোকেট এম সি মেহতা এবং পরিতোষ ত্যাগী এবং অন্য কয়েকজন মিলে যে খসড়া (বিল) তৈরি করা হয়েছিল তা সংসদে পেশ করে গ্রহণ করা হোক। ২) গঙ্গার গতিধারার উপরের দিকের অংশে, নিম্নপ্রবাহে ও উপনদীগুলির উপর প্রস্তাবিত এবং নির্মীয়মাণ সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে বন্ধ ও খারিজ করতে হবে। ৩) গঙ্গা অববাহিকায় সব রকমের খননের কাজ ও গাছকাটার কাজ নিষিদ্ধ করতে হবে। ৪) নদীর স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য কার্যনির্বাহী একটি গঙ্গাভক্ত পরিষদ গঠন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ চিঠির কোনো উত্তরই আসে নি। গুরুদাসের মৃত্যুর পর নরেন্দ্র মোদি তাঁর শোকবার্তা টুইট করেন।

২০১৩ সালে (কেন্দ্রের কংগ্রেসি শাসনকালে: অনু) তদানীন্তন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং গুরুদাসের পঞ্চমবারের অনশন চলাকালীন সময়ে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই বলে যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে গুরুদাসের সমস্ত দাবিই মেনে নেওয়া হবে।

গুরুদাস দাবি করেছিলেন, গঙ্গাকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করা হোক। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল, গঙ্গা যেন তার আদি নৈসর্গিক মহিমা না হারায়। গঙ্গার নির্বন্ধ প্রাকৃতিক প্রবাহ (অবিরল ধারা– কথাটিই তিনি উল্লেখ করেছিলেন) এবং তার প্রদূষণহীন 'নির্মল' জলধারার নিশ্চয়তাও ছিল তাঁর লক্ষ্যে। গঙ্গাকে রক্ষা করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন নর্দমার জল বা কারখানার তরল কোনো বর্জ্য গঙ্গায় ফেলার উপর যেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নদীসংলগ্ন এলাকায় দূষণকারী বর্জ্য সৃষ্টিকারী কারখানা, বননিধন, বেআইনি পাথর খাদান, বালি তোলা নদীক্ষেত্রের হানিকর পরিবর্তন, সংলগ্ন জমিতে রাসায়নিক বা ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবিও তিনি তুলেছিলেন। (উত্তরপ্রদেশ) রাজ্যের সেচবিভাগে কর্মরত থাকাকালীন রিহান্দবাঁধের

প্রযুক্তিবিদ্যাগত অভিজ্ঞতা থেকে গুরুদাসের নদীসংক্রান্ত জ্ঞান বিকশিত হয়েছিল। তিনি একেবারে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে 'অবিরল ধারা'র সংজ্ঞা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। তা হল, 'প্রতিটি জায়গায় পরিবেশ/ বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী প্রবাহ বলতে জায়গাটির সঙ্গে বাঁধের নিম্নদেশের ধারা এবং সর্বকালীন স্থায়ী খাতের ও পার্শ্বদেশের প্রবাহ, উন্মুক্ত তল, অণুদৈর্ঘ্য এবং অস্থায়ী সংযোগের প্রবাহকেও হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।' অবিরল ধারা তখনই বলা হবে, যখন নদী সর্বদাই তার খার সঙ্গে এবং দুই সংলগ্ন পারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। (নদীবক্ষে কংক্রিটের কাঠামো গড়া চলবে না) নদীকে মুক্ত আকাশের নীচে বইতে হবে (টানেলের মধ্যে নদীকে ঢোকানো চলবে না)। নদীর উপরিদেশের ধারা বরং নিচের দিকের ধারাকে দৈর্ঘ্য বরাবর অবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে (নদীর উপর কোনও বাঁধ থাকা চলবে না)। বছরের ঋতু অনুযায়ী পরিবর্তনশীল জলের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাহীনভাবে বজায় রাখতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পচনহীন, রোগব্যাধি নিরাময়কারী দূষণ শোধক ও সুস্বাস্থ্যবর্ধক যে অনবদ্য গুণগুলি গঙ্গাজলে বর্তমান সেগুলিকে বজায় রাখতে হলে অবিরল প্রবাহ একেবারেই আবশ্যিক শর্ত। একইভাবে গুরুদাসের বিচারে 'নির্মল' কথার অর্থ শুধুমাত্র PH সূচক (অম্লতা ও ক্ষারত্বের পরিমাপ) ইত্যাদি সম্পর্কিত জলের গুণের প্রথাগত সূচক-মান, দ্রবীভূত অক্সিজেন, বিওডি, দ্রবীভূত কঠিন ইত্যাদির হিসাবই নয়। তাঁর মতে, গঙ্গাজলের স্বশোধনের যে বিশেষগুণ বর্তমান, তাকে অপরিবর্তিত রাখতে পারলে তবেই গঙ্গাজল 'নির্মল' থাকবে আর এই নির্মলগুণের পিছনে রয়েছে গঙ্গার উৎস ক্ষেত্রের বিশেষ শিলাপ্রস্তর, পলল এবং বাস্তুতন্ত্রের অবদান।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, জলসম্পদ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন এবং গঙ্গা-উজ্জীবন বিষয়ের মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন, তিনি নির্মল গঙ্গার বিষয়টি অবগত, কিন্তু অবিরল গঙ্গা বিষয়টি তাঁর অবগত নয়। এর থেকে এটি স্পষ্ট যে গুরুদাসের 'অবিরল গঙ্গা'র তত্ত্বটি গৃহীত হলে ভবিষ্যতে আরও বাঁধ নির্মাণের পথে তা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করত। শাসক বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে আর একটি মত বেরিয়ে আসছে, সেটি হচ্ছে এই যে, উন্নয়ন সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। মনে হয় উন্নয়নের এই ধরন (ও ধারণা) কর্পোরেট-চালিত। আরও মনে হচ্ছে যে, সামনের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে দলই রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসুক না কেন নির্বাচনে ঢালাও পরিমাণ টাকা কর্পোরেটদের তহবিল থেকেই নিয়োগ করা হচ্ছে। গুরুদাস এবং সরকারের ভিতর যোগসূত্র স্থাপনে সচেষ্ট এক উঁচু মাপের আর এস এস কর্তা যদিও জানিয়েছিলেন, তিনি তত্ত্বগতভাবে গুরুদাসের মতের সঙ্গে সহমত, কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যের উপর শিলমোহর এঁটে দিল এবং সেই সঙ্গে গঙ্গার ভাগ্যও বাঁধা পড়ে গেল। এরকম ভয়ংকর পরিণতির আতঙ্কের মেঘ বিভিন্ন নদী উপত্যকার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার উপর ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ইউপিএ আমলেও গুরুদাস (তাঁর দাবি নিয়ে) পাঁচবার অনশনে বসেছিলেন। এখনকার এনডিএ সরকারের আমলে তাঁকে জীবন দিতে হল। এতেই প্রমাণিত যে, এই সরকার উন্নয়নের যে ধাঁচ প্রয়োগ করতে চাইছে তা আরও বেশি পরিমাণে কর্পোরেট-স্বার্থবাহী এবং আরও মানবিকতাবিরোধী। সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়গুলি সম্পর্কে এরা একেবারেই সংবেদনশীল নয়। এই মাসের প্রথমেই যেখানে জাতিসঙ্ঘের দেওয়া 'পৃথিবীর সেরা চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে কিই বা আসে যায়!

গুরুদাসের মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, তা অপূরণীয় বললে ভুল হবে না। গঙ্গার পক্ষে আর কোথাও কোনও সরব কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে কি? ধর্মীয়মনস্ক বহু মানুষের কাছে গুরুদাস ছিলেন পুরাণে কথিত ভগীরথের ছাঁচে গড়া, হিন্দু পুরাণগাথা অনুযায়ী যাঁর সাধনাশ্রমে স্বর্গ থেকে গঙ্গা মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গুরুদাসকে যাঁরা শোকাবনত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান, তাঁদের অবশ্যই পরিবেশ-প্রকৃতি ধ্বংসকারী উন্নয়নের পথে চলায় মত্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে, সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে, নদীবক্ষ অববাহিকা অঞ্চল থেকে বালি থেকে শুরু করে সব প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠেরা কন্ট্রাক্টরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামতে হবে।

গঙ্গা সংরক্ষণের লড়াই শেষ হয়ে যায় নি। শেষপর্ব অনেক দূরের ব্যাপার। গুরুদাসের অন্তিম অনশনস্থল ছিল হরিদ্বারের মাতৃসদন, সেই আশ্রমের প্রধান মহারাজ স্বামী শিবানন্দ মোদিকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি ও তাঁর আশ্রম এই অনশনে আত্মবলিদানের পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। স্বামী গোপালদাস, ঐ আশ্রমের এক সাধু জুন মাসেই গুরুদাসের অনশন শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই ঐ একই দাবিতে অনশন শুরু করেন। এর আগে মাতৃসদনের সন্ন্যাসী স্বামী নিগমানন্দ ২০১১ সালে অনশনরত অবস্থায় ১১৫তম অনশন দিবসে মারা যান। উন্নয়নের যূপকাষ্ঠে এরকম আর কত প্রাণ বলিদান দেওয়া হবে?

অনুবাদক বিজয় সরকার

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

চাঁদমামা যখন সহযাত্রী

সমীরকুমার ঘোষ

‘জোছনা করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি, গলি দিয়ে চলে যায়...’— রবি গুহ মজুমদারের কথায় ও সুরে বেগম আখতারের কণ্ঠে এই মোহময় গজলটি শোনেননি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চাঁদের সঙ্গে মানুষের রোমান্টিক চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ককে অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কথায়, সুরে, গায়নে। সম্প্রতি এক গীতিকার জোছনাকে ছেড়ে একেবারে চাঁদকেই ধরেছেন। একধাপ এগিয়ে ‘চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে’ বলে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সে করুন, কবিরা ওরকম কল্পনার বশে অনেক কিছু করেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মঙ্গল গ্রহের মাপের কিছু একটা পৃথিবীর ঘাড়ে এসে পড়ায় ধরণী দ্বিধা হয়ে চাঁদের সৃষ্টি। পৃথিবীজাত হলে কি হবে তার সঙ্গে চাঁদের মিল প্রায় মেলেই না। চেহারা বদখত। রুখাসুখা, পাহাড়, উপত্যকা, খাদে এবড়ো-খেবড়ো। অনেকটা আবহাওয়ার ধাঁচের পাতলা এক আস্তরণ পাওয়া যায় বটে, এতে শ্বাস নেওয়া যায় না। পরিভাষায় একে ‘অ্যাটমস্ফিয়ার’ না বলে, বলা হয় ‘এক্সোস্ফিয়ার’।

সৌর জগতে ১৯০টার মতো উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আকারে এবং উজ্জ্বলতায় পঞ্চম আমাদের চাঁদ। গ্যালিলেও গ্যালিলি ১৬১০ সালে বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। তার আগে আকাশে যে আরও চাঁদ আছে মানুষ তা জানত না, তাদের কাছে আমাদের চাঁদই ছিল সবেধন নীলমণি। তাকেই ‘দ্য মুন’ বলে উল্লেখ করা হত।

চাঁদ শুধু আমাদের কল্পনা আর স্বপ্নের পাইকারি জোগানদার, তার অন্য ভূমিকা নেই, এটা ভাবলে ভুল হবে। এই চাঁদের জন্যই এই পৃথিবীটা প্রাণীদের কাছে বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এখানকার আবহাওয়ার স্থায়িত্বেও চাঁদের ভূমিকা অনেকখানি। আর চাঁদের আকর্ষণে যে জোয়ার-ভাঁটা হয়, সে তো জানাই। সে যাই হোক, ফিরি গানের কলিতে। বাড়িতে চাঁদ কেন আসে না, সেই অনুযোগ নিয়ে। আস্ত তো দূরের কথা, চাঁদের একটা আধলাও যদি বাড়ির চালে এসে পড়ে কী হবে, তা কবিকে ভাবতে অনুরোধ করি। তবে একথা ঠিক, দূর থেকে চাঁদকে, বিশেষত পূর্ণিমায় ভরা জোছনায়, মোহময় লাগে। কবিরা বিশেষ করে চাঁদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। চাঁদের আরেক নাম লুনা থেকেই ‘লুনাটিক’ কথাটা এসেছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে তাবৎ কবিই চাঁদকে, বিশেষত তার আলোকে নিয়ে রোমান্টিকতার হদ্দমুদ্দ করেছেন।

ছড়ার সুবাদে শৈশব থেকেই চাঁদের সঙ্গে আমাদের মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক। মায়েরা এক সময় সন্তানকে ঝিনুক-বাটিতে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বা ছেলে ভোলাতে ‘আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা’ আওড়াতেন। বিদেশে অবশ্য চাঁদকে, বিশেষত পূর্ণিমার চাঁদকে ঘিরে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে, আমাদের চাঁদমামা তেমনটি নয়। তার সঙ্গে আমাদের যে ভারি নিকট-সম্পর্ক। তাই তো আমরা যখন দূরে গাড়িতে বা ট্রেনে লম্বা সফর করি, চাঁদমামা আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। সাঁইসাঁই গতিতে গাছপালা, ঘরবাড়িকে পিছনে ফেলে এগোই, চাঁদকে

পারি না। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখি, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কেন এমন মনে হয়? গাছপালার মতো সেও পিছনে পড়ে যায় না কেন?

এর মূল কারণ— বিশাল দূরত্ব। কিন্তু মজার কথা হল, চাঁদ যে আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে, সেটা দেখে আমরা টের পাই না। পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব ২৩৯,০০০ মাইল, কিলোমিটারের হিসাবে ৩৮৫,০০০। চাঁদের পরিধি ২১৬০ মাইল। কিন্তু বড় শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেও মনে সে বুঝি, শ'দুয়েক মাইল দূরে বসে আছে।

যেহেতু চাঁদকে খুব কাছে আছে বলে মনে হয় এবং বেশ বড় দেখায়, সেহেতু আমরা ভুলেই মেরে দিই যে সে আসলে প্রায় আড়াই লাখ মাইল দূরে রয়েছে। আর এই যে গাড়ি বা ট্রেনে যাওয়ার সময় আমাদের মনে হয় চাঁদ মামা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, তা ওই দূরত্বের কারণেই।

ঠিকভাবে বলতে গেলে এটা এক ধরনের অনুভূতি, এর পিছনে মানসিক প্রতিক্রিয়ারও একটা বড় ভূমিকা আছে। আমরা যখন ছুটন্ত গাড়িতে বা ট্রেনে চেপে যাই, দেখি গাছপালা, ঘরবাড়ি, বেড়া মায় রাস্তাও উল্টোদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

পাশাপাশি চাঁদকে দেখুন। তার তেমন বিশেষ হেলদোল নেই। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, অন্য জিনিসগুলোর মতো সেও উল্টোদিকে ছুট না লাগালেও, সরে তো যাবে! তা যখন সত্যিই যায় না, তখন আমাদের মনে হয় চাঁদ বুঝি আমাদের অনুসরণ করে চলেছে।

কিন্তু কেন এমন হয়? কারণটা আগেই বলা হয়েছে— বিশাল দূরত্ব। আমাদের গাড়ি বা ট্রেন কয়েক মিনিটে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তার থেকে চাঁদের দূরত্ব অনেক অনেক বেশি। ফলে আমরা যখন এগোই, তখন চাঁদের সঙ্গে আমাদের কৌণিক দূরত্বে কিছুই হেরফের হয় না।

আমরা যদি মাইলের পর মাইল সোজা পথেও যাই, তাতেও যে কোণ থেকে চাঁদকে দেখা যায়, তাতে কিছুই বদল হয় না। এদিকে আমরা আর সব কিছুকেই উল্টোদিকে ছুটতে দেখছি। তা থেকেই আমাদের মনে প্রত্যয় হয়, চাঁদমামা আমাদের পিছু নিয়েছে।

চাঁদের কথায় তার এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথাও জানানো যাক। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গ্রহ, তারা সব কিছুরই মাপজোক করে থাকেন। প্রতিটি উপগ্রহের মাপও আলাদা করে নেন। উপগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁরা আরেকটা হিসাবও কষেন। মূল গ্রহের সঙ্গে তার আকারের তুলনা করে তার ভগ্নাংশ ও শতকরা ভাগ নির্ণয় করে তুলনামূলক মাপজোকও করেন। গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহের আকারগত তুলনার বিচারে চাঁদ হল সৌরজগতে বৃহত্তম উপগ্রহ। চাঁদের ব্যাস ৩৪৭৫.৬ কিলোমিটার। মাইলের হিসাবে ২১৫৯.৬৪৩ মাইল। এই সংখ্যা পৃথিবীর ব্যাসের মাপের প্রায় ২৭.২৫ শতাংশ। অন্যদিকে, সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় যে উপগ্রহটি, তার ব্যাস কিন্তু বৃহস্পতির ব্যাসের মাত্র ৩.৭ শতাংশের মতো। শনি এমনিতেই ছোট গ্রহ। তার উপগ্রহের ভাগে পড়েছে আরও কম ৩.৬ শতাংশ। তবে প্লুটোর এক চাঁদ আছে শ্যারন নামে, তার মাপ প্রায় প্লুটোর অর্ধেক। তবে প্লুটোকেই তো গ্রহ–পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা হয়েছে! তাই আমাদের চাঁদই সেরা।

উমা

শোক সংবাদ

মৈনাক চলে গেল

জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৬০
প্রয়াণ ২৮ মে ২০১৯

এ যেন একে একে নিভিছে দেউটি। উৎস মানুষ পত্রিকার দীর্ঘদিনের বন্ধু মৈনাক মুখোপাধ্যায় অকালেই প্রয়াত হল। পেশাগতভাবে মনোরোগ চিকিৎসক। থাকত বর্ধমানে। কিন্তু পেশাগত ব্যস্ততা বা কলকাতা থেকে দূরত্ব— কোনোটাই ওর পত্রিকার প্রতি ভালবাসা, দায় কমাতে পারেনি। বারবার ছুটে এসেছে, নানান দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ঘাড়ে পেতে নিতে চেয়েছে। বর্ধমানে কীভাবে উৎস মানুষ পত্রিকাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার উদ্‌যোগ নিয়েছে।

সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর পত্রিকা একটি স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করে। তাতে অশোক-ঘনিষ্ঠ অনেকেই স্মৃতিচারণ করেন। মৈনাক তার লেখা শুরু করেছিল এক ইংরেজি কোটেশন দিয়ে— 'What I will leave behind will not be engraved in some stone monuments, but perhaps woven into the lives of my close ones'। ওর আর অশোকের ভেতর যে ই-মেইল চালাচালি হত, তার প্রতিটিতেই শেষে অশোক ঐ ইংরেজি উদ্ধৃতি ব্যবহার করত।

সেটা সম্ভবত ২০০৬ সাল। অশোককে মৈনাক বর্ধমানে একটা সভায় আমন্ত্রণ জানায়। আমাকেও। ওর চেম্বার যে পাড়ায়, সেখানে মেলা ডাক্তার। কিন্তু ডাঃ মৈনাকের চেম্বার খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। ১৯৮৩ থেকে উৎস মানুষ-এর সঙ্গে মৈনাকের যোগাযোগ। ও তখন আর জি কর মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সেই যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল ২০০৮ পর্যন্ত। তারপর অনিয়মিত হলেও কলকাতায় এলে দেখা হত। বইমেলায় উৎস মানুষ-এর স্টলে একবার হলেও ঢুঁ মারত। পত্রিকায় অনেক লিখেছে, পত্রিকা বিলি করেছে, অর্থ দিয়ে, গতর দিয়ে পত্রিকার সঙ্কটে পাশে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুবৎসল, সদালাপী মৈনাক। শেষের দিকে নানা কারণে যোগাযোগ কমে গেলেও ওর অবদান ভোলা সম্ভব নয়। ওর অকালপ্রয়াণ আমাদের কাছে বিরাট দুঃসংবাদ।

বরুণ ভট্টাচার্য

বন্ধু মৈনাকের পাশাপাশি সম্প্রতি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের দুই প্রথম সারির যোদ্ধা প্রয়াত হলেন। এঁরা হলে বিজ্ঞানী মেহের ইঞ্জিনিয়ার ও নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাড।

মেহের ইঞ্জিনিয়ার

প্রয়াণ ২৪ এপ্রিল ২০১৯

বিজ্ঞানী সমাজকর্মী মেহের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন পদার্থবিদ্যার লোক। কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ছিলেন, ছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অভ সোশ্যাল সায়েন্সেসের চেয়ারম্যানও। তার বাইরে তিনি ছিলেন সর্বক্ষণের সমাজকর্মী। পরমাণুবিদ্যুতের বিরুদ্ধেই হোক বা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন— যেখানেই অন্যায়, প্রতিবাদে সরব তিনি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় প্রবল রাজনৈতিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও দিনের পর দিন ওখানে গিয়ে মানুষদের সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝানো, প্রতিবাদে সামিল করার কাজও করেছেন। মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়েও সরব ছিলেন। গত ২৪ এপ্রিল, কলকাতায় পার্সি ওল্ড এজ হোমে প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পথশিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে গেছেন। ওঁর দুটি সন্তান, বিদেশে থাকে।

শোক সংবাদ

গিরিশ কারনাড

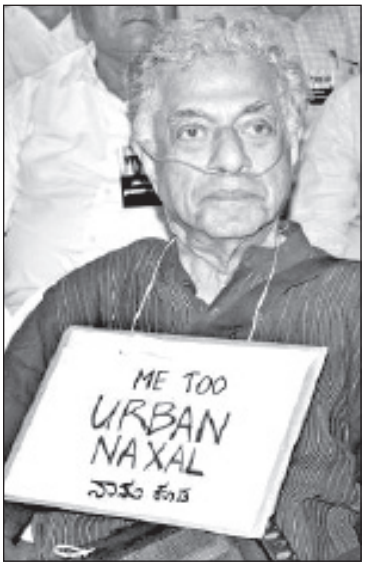

জন্ম ১৯৩৮
প্রয়াণ ১০ জুন ২০১৯

শুধু নাটক আর অভিনয় নিয়ে দিব্যি সুনামের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন গিরিশ কারনাড। কিন্তু প্রতিবাদ ছিল তাঁর রক্তে। নানা বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নাটকের মধ্যে দিয়ে সেই প্রতিবাদ তো জারি রেখেইছেন, সেই সঙ্গে গোবিন্দ পানসারে, কালবুর্গি বা গৌরী লঙ্কেশদের খুনে স্বয়ং হাজির থেকে সমর্থন করেছেন প্রতিবাদ-আন্দোলনের। শরীর ভীষণ অসুস্থ, নাকে অক্সিজেনের নল, তাতেও 'মি টু আরবান নকশাল' প্ল্যাকার্ড বুকে নিয়ে প্রতিবাদের ছবি সবাই দেখেছেন। কোনও চোখরাঙানি বা প্রলোভন তাঁকে বশ করতে পারেনি। গত ১০ জুন প্রয়াত হলেন গিরিশ।

পুস্তক পরিচিতি

এই পুস্তিকার প্রচার চাই

শ্রাদ্ধ করব নাকি শ্রদ্ধা জানাবো • সুরেশ কুণ্ডু
• বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, • দশ টাকা

কুড়ি পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা কিন্তু গুরুত্বের বিচারে তা মূল্যবান। প্রাণের পেছনে আত্মার ধারণা এবং মৃত্যুর পর দেহবিযুক্ত ঐ আত্মার উদ্দেশে নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম পৃথিবীর প্রায় সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রচলিত, হিন্দুদের মধ্যে যা পারলৌকিক শ্রাদ্ধকর্ম হিসেবে পরিচিত। এখন অতি স্বল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে এর অসারতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠলেও, তুলনায় শ্রাদ্ধকারীর সংখ্যাই অনেক ভারী।

পুস্তিকাটিতে আত্মার ধারণার সৃষ্টি, বিভিন্ন ধর্মে আত্মার ধারণা ও তা অনুসারী অনুষ্ঠান ইত্যাদির সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুদের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে কীভাবে প্রয়াত পিতামাতা বা অন্যকে প্রেত হিসেবে বর্ণনা করে অবমাননা করা হয়, শ্রাদ্ধ না করলে পুত্রের অবধারিত নরকবাস হবে বা পিতৃগণ তার রক্তপান করবেন বলে পুরুতমশাই যেভাবে ভয় দেখান, সে সবের কথাও বলা হয়েছে। শ্রাদ্ধকর্মের মতো একটি নিরর্থক কাজে সময় ও অর্থব্যয় না করে, প্রয়াত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্মরণসভা ইত্যাদির আয়োজন করা যে অনেক মূল্যবান, তাও বিস্তৃত বলা হয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে আত্মার অস্তিত্ব নেই, তাই ঐ আত্মার 'শান্তি'র জন্য ক্রিয়াকর্ম অর্থহীন— এসব কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ডিএনএ, জেনেটিক কোড ইত্যাদির আবিষ্কারের ফলে ফুৎকারে উড়ে গেল আত্মার বুজরুকি! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ডিএনএ বা জেনেটিক কোডের আবিষ্কার সরাসরি তো আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে না। বরং পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির পেছনে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কাজ করেছিল, কয়েক দশক আগে হেনরি মিলার কীভাবে পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম পরিবেশ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে দেখিয়েছিলেন প্রাণের প্রাথমিক উপাদান পরীক্ষাগারেই তৈরি হচ্ছে— এসবের বর্ণনা থাকলে ভালো হত। এছাড়া এখন 'প্রায়ন' নামে এক প্রোটিনের কথাও জানা গেছে, যা নিজে থেকেই বিভক্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। শনির উপগ্রহ টাইটানেও প্রাণের প্রাথমিক রাসায়নিক উপাদান আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

তবে, মূল যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি পূরণে এটি যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা এই ধরনের অবমাননাকর ও ক্ষতিকর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই ধরনের লেখাপত্রের প্রচার ও প্রসার যত বেশি হয় ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

ভবানীপ্রসাদ সাহু